নির্যাতিত নিগ্রো

শেখর সেনগুপ্ত

তুলি-কলম
১, কলেজ রো, কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ

প্রকাশক
কল্যাণব্রত দত্ত
তুলি-কলম
১, কলেজ রো, কলকাতা-৯

মুদ্রক
কালিপদ মজুমদার
শ্রীদুর্গা প্রিন্টিং হাউস
৩৩বি, শ্রীগোপাল মল্লিক লেন
কলকাতা-১২

প্রচ্ছদ
জহর দাসগুপ্ত

চারু ব্লকাং

ডঃ অনন্তকুমার দাশগুপ্ত কে—

It is not only dying and killing
that degrade us but base
living and accepting the ways
and profits of degradation.

—G. Bernard Shaw.

-দি বারনারড শোঅ

॥ এক ॥

জটায়ুর সন্ততায় সাগর পারে পাড়ি দিয়ে প্রথম যেখানে আমার পক্ষ-তাড়ন জখম হলো, সেটা এক অতি পরিচিত নাম,—শিকাগো। নিশি পাওয়া মানুষের মতো সব মুখস্ত বলতে পারি: "হাঁয়া শহর, প্রকাণ্ড অজগরের চাকচিক্য নিয়ে রাস্তাগুলি হারিয়ে গেছে দৃষ্টির বাইরে, কচ্ছপ-ঘাড় অমসৃণ ইট পাথরের বস্তু পিণ্ডগুলি শ্মশানচারী মৌনীবাবার ভেক ধরে আকাশ পানে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে, কসাইখানায় জমা হয় মেদ-মাংস-মজ্জা, ক্লারিওনেটের বিলাপ অশ্রুত নয়, সাদাদের তাচ্ছিল্য ও ভ্রূকুটির জবাবে স্পষ্ট প্রতিভাত হয় কালোদের প্রতিহিংসায় ধ্বক ক'রে জ্বলে ওঠা চোখগুলি।

চোখের তারা আমার নীল নয়, কালো। দেহও কালো। কিন্তু দৃষ্টিটা সোজা ও সাদা। সেই সাদা দৃষ্টিতেই সব কিছু দেখতে ও শিখতে এসেছিলাম এ দেশে।

খেচরের জঠর থেকে মুক্তি পেয়ে স্বাধীন দুনিয়ার পীঠস্থানে যেদিন এলাম, সেদিন আমার মনে বেদনা ছিল না, মালিন্য ছিল না।

কিন্তু চাপা অভিমান যে একেবারে ছিল না, তা বললে ভুল হবে। যে মুহূর্তে বস্তু বিজ্ঞানে লোভনীয় রকফেলার স্কলারশিপটা হঠাৎ লটারী জেতার উত্তেজনা নিয়ে আমার কাছে এলো, আমি আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের তকমাধারী বন্ধুদের কাছে সন্দেহ ও বিষাক্ত আলোচনার উপলক্ষ্য হয়ে দাঁড়ালাম। ওদের অনেকেই সুচতুর কাদাখোঁচা পাখীর দৃষ্টি নিয়ে আমাকে নিরীক্ষণ করতে থাকে। উত্তেজক কানাঘুষা চলে এ-কেন্দ্রে সে-কেন্দ্রে! আমি নাকি

ডলারের দালাল বনে গেছি, আমি নাকি সহজেই টোপ গিলেছি, —সিয়ার চম্ হতে চলেছি!

আজ আমার বিক্ষত হৃদয় নিঃশ্বাসের নিঃস্বণে জানিয়ে দেয়ঃ দালাল তুমি হওনি। সিয়ার চম্ তোমাকে বানাতে পারেনি।

ভাবনার অতলান্তে দক্ষ ডুবুরীর মতো ডুব দেবার আশায় আমি মাঝে-মাঝে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর ত্যাগ করে নেমে আসি। বুক ভরে মাটির ঘ্রাণ নেই। আব্রাহাম লিঙ্কনের দেশ বুঝি উচ্চ-লম্ফনের শেষ ধাপে এসে পৌঁছেছে। কিন্তু লম্ফন যতই উচ্চ হোক না কেন, এর পদযুগল ক্ষতবিক্ষত, রক্তাক্ত। সাম্প্রদায়িক ও বর্ণবিদ্বেষের বিষাক্ত ধোঁয়া এখানে ন্যুইয়র্কের উপর সম্ভাব্য আনব-আক্রমণের চেয়েও কম বিপর্যয়কর নয়।

আমেরিকাকে অত সহজে চেনা যায় না। পাঁচ বছর চোখের উপর আতস কাঁচ লাগিয়ে রেখেও অনেক সময় ধাঁধিয়ে যাই! বুঝি আমার ধারণায় নিক্তির ওজন কোথাও কম বেশী হয়ে গেল।

শিকাগো থেকে পাখা মেলে হালে ঘুরে এলাম ক্যালিফরনিয়া। ক্যালিফরনিয়া প্রকাণ্ড! উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিম,—চারদিকটাই অশ্বমেধের ঘোড়ার মতো টগবগিয়ে ঘুরে বেড়ানো আমার সাধ্যাতীত।

কাজেই তারিয়ে তারিয়ে রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শের পরিপূর্ণ আস্বাদন নিতে একপক্ষ ছুটি কাটালাম শিল্পীর তুলিতে টানা শহর রিভারসাইডে। মার্কিন মুলুকের এক মফস্বল শহর। কিন্তু বৈভবে ও দীপ্তিতে যে কোন নগরীকে টেক্কা দিতে পারে। হলিউডের দমকা বাতাস সেখানে অহরহ ঘা মারে, রুবিড্যো পাহাড়ের কোলে বিশ্রাম নিতে আসেন বিশ্বখ্যাত ফিল্ম স্টাররা।

রিভারসাইডের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আমার জন্মভূমির কথা মনে করিয়ে দেয়। এখানে আমি দেখেছি, সার সার নারকেল আর খেজুর কুঞ্জ; দেখেছি, কাকচক্ষু গহীন জল বাতাসের সোহাগ-স্পর্শে

তিরতিরিয়ে কাঁপতে ; আর আশ্চর্য হয়ে শুনেছি, কাক ডাকছে। পাঁচ বছর লিঙ্কনের দেশে থেকে শুধু এই রিভারসাইড শহরেই কাকের ডাক শুনতে পেয়েছি।

রিভারসাইডে আগমন আমার অবশ্য এই প্রথম নয়।

আর একবার এসেছিলাম সেই ১৯৬৫ এর জুন মাসে। আমায় পথ চিনিয়ে নিয়ে এসেছিল মিকি।

মিকি অর্থাৎ মাইক। আরো বিস্তারিত ব্যাখ্যায় বলা চলে, মাইকেল ভ্যালেনটাইন। বছর বাইশ-তেইশের স্বাস্থ্যোজ্জ্বল নিগ্রো যুবক। চওরা বুক, খাঁচ কাটা কপাল, প্রশস্ত নাশারন্ধ্র আর যেন অনেকটা অসহায় পুরু ঠোঁট দুটো। আমি স্কেচ করতে ভালোবাসি। তাই অনেকদিন অনেকভাবে মিকির ছবি আমি চকিতে খাতাবন্ধ করেছি। কখনো সে গাড়ী ড্রাইভ করছে, কখনো শেক্ নাচছে, দু' হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে নিজের অভিশপ্ত ভাগ্যের কথা ভাবছে। প্রতিটি ছবি ওকে মুগ্ধ করতো। হাততালি দিয়ে লাফিয়ে উঠতো, খল্ খল্ প্রাণখোলা হাসিতে জানিয়ে দিত : Splendid ! You are unparallel.

মিকির আস্তানা রিভারসাইডে। কিন্তু শিকাগোতে সে গিয়েছিল রুটির সন্ধানে। নিম্ন তলার নিগ্রো এরা। রুটির বিলাপে তারা দিশেহারা। কাঁড়ি কাঁড়ি ডলারের চাকচিক্যে আমরা প্রায়ই উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়ি,—তাই এদের খবর আমরা নেই না এবং জানতেও পারি না।

মিকি শিকাগোতে ঘুরে ঘুরে অনেক হন্যে হয়েছে। তারপর কাজ পেয়েছে সানবারনানডিনোর জাঁদরেল ইঞ্জিনীয়ার টমাস ব্লেকের ফ্ল্যাটে। ব্লেক মাসের মধ্যে পঁচিশ দিনই বাড়ী থাকেন না। মিসেস্ ব্লেকের পদসেবাই মিকির মুখ্য কাজ। অনেক কিছুই করতে হয়,—টেবিল, চেয়ার, সোফা, ডিভান ইত্যাদি ঝকঝকে

তকতকে রাখতে হবে, ভোরে উঠেই গিন্নিমার পছন্দসই জিনিসগুলি গাড়ী চালিয়ে কিনে আনতে হবে বিভিন্ন মার্কেট থেকে, অপছন্দ হলে আবার ফেরৎ দেবার পালা। এ ছাড়াও আর একটা অস্বস্তিকর কাজ করতে হয় মিকিকে, যা ভাবলেও সমস্ত শরীরটা শির শির করে ওঠে। স্নানের ঘরে মিসেস ব্লেকের নগ্ন দেহকে দালাই মালাই করতে হয় তার। ওঁর সুগঠিত স্তন, বিশাল পাছা, আর স্বৈরিণী স্পর্ধায় স্ফীত বস্তিদেশ দেখতে দেখতে এক এক সময় কেমন হিম পাথর হয়ে আসে মিকি। কবরখানার হাতভাঙ্গা নিশ্চল প্রতিমূর্তির মতো অনেকক্ষণ স্থির থেকে হঠাৎ ডুকরে কেঁদে ওঠে।...

অবশ্য আমার সঙ্গে মিকির যখন পরিচয়, তখন সে কাঁদতে ভুলে গেছে। ক্রমাগত পদদলিত নিগ্রোর অন্তিম সংগ্রামী চেতনা তাকে তখন পেয়ে বসেছে। সে ভাবতে শিখেছে। কিন্তু ঠিক ভেবে উঠতে পারছে না,—কোন পথটি তার? সংগ্রামের দুটি ডাক এসেছে দু' ধার থেকে,—একটা মার্টিন লুথার কিংয়ের, অপরটা এলিজা মহম্মদের। একটি খৃষ্টের অহিংস প্রতিবাদের বেদীমূলে রচিত; অপরটি ইসলামের নামে এক চূড়ান্ত আপোষহীন মধ্যযুগীয় রক্তস্বাক্ষর আঁকবার দ্যোতনা। কোনটা বেছে নেবে মিকি? কোনটা?...

শিকাগোর ম্যাডোনা পার্কে ট্যাক্সির প্রত্যাশায় দাঁড়িয়ে আছি। সময়টা ১৯৬৫ এর মে মাস। প্রথম বেলার কচি কলাপাতা রোদ দেখে সবাই দিশেহারা। পার্কের সবুজে সবুজ আঙিনায় হাত-পা ছড়িয়ে বসে বসে রোদ পোয়াচ্ছে যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা। কিছুদূরে একদল মেয়ে শকট্ খেলছে। ওদের উচ্ছ্বসিত ধ্বনিতরঙ্গ ভেসে আসে।

হঠাৎ একটি চমৎকার শেভ্রোলে জেট বিমানের মতো ধোঁয়া ওড়াতে ওড়াতে আমার কাছে এসে থেমে পড়ে। গাড়ীর ভিতর

থেকে একটি হাসি খুশী কালো মুখ বেড়িয়ে আসেঃ ট্যাক্সি খুঁজছেন ?

ঃ হাঁ, কিন্তু আপনার যে প্রাইভেট কার।

ঃ আপনাকে আমি সানন্দে লিফট দিতে রাজি।

গাড়ীতে উঠে বসতেই নিগ্রো যুবক আবার স্টার্ট দিল। আস্তে আস্তে ভিড় জমে উঠছে। এখনো যেন বড়দিনের আমেজটুকু ধরে রাখা যায়। গুটিকতক চড়ুই পাখীর মতো ছটফটে পাঁচটি শিশু নীচু হয়ে মুঠো মুঠো ঘাঁস ছিঁড়ছে পার্কের। এ্যাক্সিলেরেটারে মৃত্তু চাপ দিয়ে শক্ত হাতে স্টিয়ারিং ধরে আছে নিগ্রোটি। মুখে তার একটা মোটা চুরুট। বেশ যেন আমেজ অনুভব করছে টানতে।

ঃ আপনি তো ভারতীয় ?

প্রশ্ন শুনে চমকে উঠলাম। কোন উত্তর দেবার আগেই সে মাথা নাড়তে থাকে, আমি জানি, আমার ধারণা ঠিক। আমি ব্লেকের চাকর হলে কী হবে, এই চলমান ত্বনিয়ার অনেক খবরই রাখি।

সেই প্রথম মিকির সাথে পরিচয়। নিম্নআয়ী, কিন্তু রাজনীতি-সচেতন নিগ্রো পরিবারের সন্তান। নিগ্রোদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তার দারুণ ত্বশ্চিন্তা।

আমি বলেছিলামঃ তোমাদের উচিত মার্টিন লুথার কিংয়ের নেতৃত্বকে স্বীকার করে নেয়া।

মিকি জবাব দিয়েছিলঃ মার্টিনের প্রতি প্রতিটি নিগ্রো শ্রদ্ধাশীল ...কিন্তু মনে প্রশ্ন জাগে এই শান্তির পথে আমাদের প্রকৃত মুক্তি আসবে কি ?

নিগ্রো যুব-মানস পরিপূর্ণ শান্তিতে আর আস্থা রাখতে পারছে

না। দক্ষিণে তারা এতকাল যে প্রচণ্ড মার খেয়ে এসেছে, এবার তার প্রতিবাদ জানাতে তারা হয়তো সহিংসও হয়ে উঠতে পারে।...

অনেক রাতে 'ওয়েলকাম' হোটেলের ঝুল বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমি শুধুই ভেবেছি। আমার চোখের সামনে ফোর্ড কোম্পানীর অতিকায় বিজ্ঞাপনটা চমকপ্রদ বৈদ্যুতিক কায়দায় যেন সিংহের মতো উদ্ধত থাবা তুলে দাঁড়িয়েছিল।

ভাবতেও গভীর বেদনা।

আমেরিকার তৃষিত মাটি যত গণনেতার রক্ত বার বার পান করেছে, পৃথিবীর অন্য কোন দেশের ইতিহাসে তা দেখা যায় না। মহাত্মা গান্ধী শহীদ হয়েছিলেন একেবারে পরিণত বয়সে; কিন্তু আটত্রিশ বছরের বিশ্ববন্দিত শান্তিবাদী নিগ্রো নেতা মার্টিন লুথার কিংয়ের হত্যা যেন আরো বেদনাবিধুর, জঘণ্য এবং পাশবিক সম্ভাবনায় ভরপূর!

লুথার কিংকে চাক্ষুষ দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়নি। মিকি দেখেছে অনেক বার। ওর বর্ণনায়ঃ অমন ঘরোয়া মানুষ আর হয় না! কিংয়ের অনেক মতের সাথে আমি একমত হতে পারি না, কিন্তু তাঁর আন্তরিকতাটুকু কখনো ভোলা যায় না। সেই কণ্ঠস্বর, সেই পরিমিত আবেগ...আমার প্রতিটি ইন্দ্রিয়ে চিরদিন অতন্দ্র থাকবে!

মিকি বলছিল আর আমি চোখ বুজে কল্পনা করে নিচ্ছিলাম। যেন দেখতে পাচ্ছিলাম, গথিক-রীতির কারুকার্যে মণ্ডিত এবেনিজার ব্যাপ্টিস্ট গির্জায় বসে কিশোর লুথার গান গাইছে। যীশুর প্রেম ও সহানুভূতি আশ্চর্য সাঙ্গীতিক রূপ নিয়েছে তার দরাজ গলায়। বাবা সিনিয়র কিং মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে আছেন ছেলের মুখের দিকে। নিজের সমস্ত চেতনাকে কেন্দ্রীভূত করে তাঁর নিশ্চিত প্রত্যয়

জন্মালো : লিটিল মার্টিন একদিন জগৎ সভায় নিজের আসন করে নেবে।

কিংয়ের জন্ম ১৯২৯ সালের ১৫ই জানুয়ারী। পিতা-মাতার মধ্যম সন্তান সে। বড় বোন ক্রিসে এবং ছোট ভাই এ. ডি.-র সাথে তাঁর বয়সের তফাৎ সামান্যই। কিংয়ের যখন জন্ম, তখনও নিগ্রো-আন্দোলন আমেরিকার বুকে তেমন দানা বাধেনি। নিগ্রোরা নিজেদের পছন্দমতো যে কোন অঞ্চলে বসতি স্থাপন করতে পারতো না, পারতো না নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী সুন্দর বাসগৃহ প্রস্তুত করতে।

সাদাদের চোখে কালারা চিরন্তন ক্রীতদাস। এরা জন্মেছে শুধু একটির পর একটি মৃত্যুর নোটিশ লিখে যাবার জন্য। এব্রাহাম লিঙ্কন ক্রীতদাস প্রথাকে মুছে দিয়েছিলেন ; কিন্তু তাঁর অতৃপ্ত অত্মা আজও বুঝি গুমরে মরে,—প্রচ্ছন্ন দাসব্যবসায়ে জর্জরিত মানবিকতাকে এখানে প্রতি মুহূর্তে হত্যা করা হচ্ছে।

নিগ্রোরা বস্তুতঃ দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক। তাদের বসবাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল কতকগুলি 'কালো অঞ্চল'। ঐ অঞ্চলগুলি নির্যাতিত ইহুদীদের 'ঘেটো'র সামিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যলগ্নে মদগর্বী ফ্যুরার হিটলার লক্ষ লক্ষ ইহুদীকে বলির পাঁঠার মতো আলাদা করে রেখেছিলেন প্রাচীর ঘেরা সংকীর্ণ নরক 'ঘেটো' গুলিতে। সেই নারকীয় পরিবেশ অলক্ষ্যে গড়ে উঠেছিল 'স্বাধীন দুনিয়া'র প্রধান ভাষ্যকার যুক্তরাষ্ট্রের 'কালো অঞ্চল' গুলিতে। ফ্যুরার ইহুদীদের গ্যাস চেম্বারে ঢুকিয়ে মুহূর্তের মধ্যে ধোঁয়ায় রূপান্তরিত করতেন ; আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিচিত্র শাসনযন্ত্র যেন ক্রমশ স্লো পয়জন করছে সমগ্র নিগ্রো সমাজকে, ধীরে ধীরে অথর্ব হয়ে আসছে তাদের স্বাভাবিক বিকাশ।

বেশীদিন আগের কথা নয়। মাত্র তিন দশক আগেও যুক্তরাষ্ট্রে নিগ্রোদের এই হাল ছিল। এমনই এক কালো অঞ্চলের কোহিনুর

হ'য়ে উঠতে পেরেছিলেন মার্টিন লুথার কিং। উচ্চস্তরের পরিবেশ তিনি পাননি। ছোটবেলাটা কেটেছিল অশিক্ষিত ক্ষেতমজুরদের মধ্যে। নিগ্রো দিনমজুরদের দারিদ্র্য কল্পনা করা যায় না। মনে হয় যেন বাংলা দেশের কোন বস্তীর ভিতর দিয়ে চলেছি। সেই পুবালী হাহাকার, দিনের পর দিন অনাহার, দেহের বিলাপে বিকৃত যৌনবোধ, কুৎসিৎ মানসিকতা! ভাবতে অবাক লাগে, এই সব ঘেটোর মধ্যে থেকেই কিছু কিছু নিগ্রো জীবন-সংগ্রামে প্রতিষ্ঠিত হতে পারতো। অনেক সর্বজন পরিচিত নিগ্রো নেতার ক্রমবিকাশ কিন্তু এই সব কালো অঞ্চলের বীভৎস পরিবেশ থেকেই। যেমন মার্টিনের বাবা সিনিয়র কিং। বার বার উপলাহত নদীর মতো এগিয়ে যাবার সংগ্রামে তিনি এক কৃতী পুরুষ। কালোদের কাছে তিনি নমস্য,—অমন বিনয়ী অথচ পণ্ডিত পাদ্রি বড় একটা দেখা যায় না!

কিং বড় বড় চোখ মেলে বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতেন। বাইবেলের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা শুনতে শুনতে তার ছোট্ট বুকখানির মধ্যে যেন ঝড়ের মাতন শুরু হয়ে যেত।

কিন্তু শান্তির বাণী অন্তরে নাড়া দিলেও, বাইরে তা প্রয়োগ করা যে রীতিমত কঠিন। সেখানে মানুষ মানুষকে বিশ্বাস করে না, সাদাদের ঘৃণা আর অত্যাচারে অবরুদ্ধ অভিমানে ক্রমশই যেন ভিসুভিয়স হয়ে উঠছে কালোদের পোড় খাওয়া চেতনা।

বাবার হাত ধরে মার্টিন একদিন শহরের বুকে হাঁটছিলেন। হঠাৎ এক শ্বেতাঙ্গ পুলিশের কর্কশ গলায় তাঁদের থমকে দাঁড়াতে হলো। পুলিশটি তাঁর বাবার পথরোধ করে দাঁড়িয়েছে: এই ছোকরা তোর লাইসেন্সটা দেখি!

বাবার প্রতি এমন তাচ্ছিল্যসূচক সম্বোধন মার্টিন এর আগে কোনদিন শোনেনি, ভাবতেও পারেনি।

রেভারেণ্ড কিং কিন্তু শান্তভাবে লাইসেন্সটা বার করলেন।

কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন শ্বেত পুলিশের মুখের দিকে। তারপর চাপা শ্লেষের সুরে বললেন: আমার ছেলে মার্টিন এখনো ছোকরা, —আমি বয়স্ক মানুষ।

অভিজ্ঞতার তিক্ততা এই একটা নয়। যত বড় হয়েছেন, ততই সেই অভিজ্ঞতা বেড়েছে। আর ততই ঋজু ও বলিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন মার্টিন। একবার এক শ্বেতাঙ্গিনী বাজারের মাঝখানে মার্টিনকে চড় কষিয়েছিল। কারণ, কালো ছোকরার নোংরা পা নাকি তাকে মাড়িয়ে দিয়েছে!

বেদনাতুর অন্তরে ঘরে ফিরে অভিধান ঘেঁটে মার্টিন একটি বিশেষ শব্দ খুঁজে পেলেন,—প্রেজুডিস্! শব্দটির উৎপত্তি দুটি ল্যাটিন শব্দ থেকে,—'প্রে' অর্থাৎ পূর্ব এবং 'জুডিসিয়াম' অর্থাৎ সিদ্ধান্ত বা বিচার। সামগ্রিক ভাবে শব্দটির অর্থ: অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত!

সেই দিন, সেই ক্ষণে মার্টিন অনুভব করলেন: সমগ্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায় এই প্রেজুডিসে আচ্ছন্ন হয়ে আছে!···

মিকি একটু থামলো। তাকিয়ে দেখলো, আমি তন্ময় হয়ে ওর কথা শুনছি কিনা। আমার অন্যমনস্কতা দেখলে নিশ্চয় লজ্জা পেত এবং ক্ষমা চেয়ে উঠে যেত। কিন্তু আমার বেশ ভাল লাগছিল ওর মুখে আমেরিকার গান্ধীর পরিচয় পেতে।

মিকি বলছিল: অসন্তোষ আমাদের কয়েক শতাব্দীর। আগে মুখ বুজে সহ্য করতাম, এখন আর তা করি না। আমরা লেখাপড়া করছি, ভাবতে শিখেছি, যুক্তরাষ্ট্রকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি আমরা। আর প্রতিবাদ করবার অধিকারটুকুও আমাদের থাকবে না? থাকবে না সাম্যের দাবী?

মার্টিন একথাই বলেছিলেন মন্টগোমারীতে গিয়ে। বর্ণবিদ্বেষের সূতিকাগার মন্টগোমারী। এখানে বাসে চলাচল করতে গিয়ে

প্রতিটি নিগ্রোকে অপমানিত হতে হয়। তাদের জন্য বাসের পিছন দিকে থাকে সীমিত সংখ্যক আসন,—সামনের সারিতে বসবার অধিকার তাদের নেই।

কিং মণ্টগোমারীর প্রতিটি প্রার্থনা সভায় এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠলেন। প্রত্যেক নিগ্রো সহযোদ্ধার কাছে তাঁর আবেদন: আপনারা বাসে ওঠা বন্ধ করুন। পায়ে হেঁটে অফিসে যান, কাজ কারবার চালান। বর্ণদ্বেষী বাস কোম্পানীগুলি এই নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধেই জব্দ হয়ে যাবে।

সম্পূর্ণ গান্ধী-প্রদর্শিত পথেই মার্টিন লুথার কিং তাঁর সংগ্রামী নৌকার পাল তুলে দিলেন।

প্রথম স্ফুলিঙ্গ জ্বলে উঠলো এক নির্যাতিতা নিগ্রো মহিলা মিসেস্ রোজা পার্কসকে নিয়ে। শ্রীমতি পার্কস পেশায় ছিলেন দরজী। তিনি একদিন আরো তিনজন অশ্বেতকায়কে নিয়ে 'শ্বেতাঙ্গদের জন্য সংরক্ষিত' আসনে বসে পড়লেন। চলমান বাসে এ এক অদ্ভুত দৃশ্য। ড্রাইভার, কণ্ডাক্টর, যাত্রী সাধারণ হতবাক।

কণ্ডাক্টর এসে চিৎকার শুরু করে দেয়: এটা সাদাদের জন্য আসন; তোমরা নিগ্রোদের সীটে চলে যাও।

মিসেস্ পার্কসের সঙ্গে যারা ছিলেন, তাঁরা সামান্য ইতস্ততের পর উঠে দাঁড়ালেন। কিন্তু পার্কস অনড়, গ্যাঁট হয়ে নিজের সীটে বসে রইলেন।

অন্য উপায় না দেখে কণ্ডাক্টর ও ড্রাইভার পুলিশ ডেকে আনে। আইন ভঙ্গের অপরাধে গ্রেপ্তার হলেন মিসেস্ পার্কস। কয়েদখানায় স্থান হলো তাঁর।

'ন্যাশনাল এসোসিয়েশন ফর দি এ্যাডভানস্‌মেণ্ট অব কালার্ড পীপ্‌ল্‌'এর সভাপতি ই, ডি, নিক্সনের কানে গেল খবরটা। মিসেস্ পার্কসকে মুক্ত করতে আদালতে ছুটে গেলেন তিনি সেখানে গিয়ে দেখেন তাঁর আগেই লুথার কিং উপস্থিত হয়েছেন।

কিং বললেন : এ অন্যায়ের কার্যকরী প্রতিবাদ জানাবার একমাত্র উপায় হলো বাস বয়কট।

সেই রাত্রেই সভা বসলো এক গির্জায়। ডিসেম্বরের হিমেল বাতাস অনবরত ঝাপটা মারছিল। কুঁকড়ে আসছিল প্রত্যেকের দেহ। তবু গুটি গুটি কালো মানুষ অলস্টারে আপাদমস্তক ঢেকে এগিয়ে আসছিল। রাত গভীরে জমায়েত হয়েছিল হাজার হাজার নিগ্রো নর-নারী। নীরব প্রতিবাদে ইস্পাত কঠিন ওদের মানসিকতা।

গম্ভীর, অথচ দরদী কণ্ঠস্বরে মার্টিন লুথার কিং ওদের বললেন : আমার নির্যাতিত ভাই-বোনেরা, আর এমন অপমান মুখ বুজে সহ্য করো না। তোমরা নিজেদের পদযুগলের উপর নির্ভরশীল হও, বয়কট করো মদগর্বী বর্ণদ্বেষী বাস কোম্পানীগুলিকে !···

মিকি তার উজ্জ্বল চোখ দুটো মেলে একবার দেখে নিলো, আমি সাগ্রহে শুনছি কি না। আসলে এ ইতিহাস আমার জানা আছে। তবু ভালো লাগছিল একটি সাধারণ নিগ্রো যুবকের মুখ থেকে সেই বর্ণনা শুনতে। মিকিকে মনে হচ্ছিলো তাঁবু-বাসী কোন হাপসি। যেন সদ্য তলোয়ার ঘুরিয়ে এসে বিশ্রাম নিচ্ছে। কিন্তু অতীত সাফল্যের বেশটুকু এখনো মুছে যায়নি মন থেকে। থেকে থেকে নাচের ভঙ্গীতে পা দোলাচ্ছে। আমি আজ পর্যন্ত যত নিগ্রোকে দেখেছি, আমার মনে হয়েছে তারা প্রত্যেকেই যেন এমন নৃত্যরত। ওরা নেচে নেচেই আনন্দ প্রকাশ করে, আবার নাচের মধ্যেই মূর্ত হয়ে ওঠে যত বেদনা! এক সন্তানহারা বায়াফ্রান জননীকে আমি একবার গভীর দুঃখে নেচে উঠতে দেখেছিলাম। অবিস্মরণীয় দৃশ্য! কায়রোতে এক বনেদী হোটেলে তার সাথে পরিচয় হয়েছিলো ···

যাক, সে কথা। মিকির মুখের দিকে তাকিয়ে আছি। ফস্ করে একটা ভারতীয় বিড়ি ধরালো সে। মিষ্টার ব্লেক তাকে এক

তাড়া বিড়ি উপহার দিয়েছিলেন। ইদানীং আমেরিকার ইনটেলেকচুয়াল মহলে ভারতীয় বিড়ির কদর খুব। ডাক্তাররাও সার্টিফাই করেন: বিড়ি সেবনে ক্যান্সারের ভয় নেই।

এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে মিকি আবার আরম্ভ করলো: সারাটা দেশ জুড়ে বিরাট হৈ-চৈ। রাতারাতি নেতার আসন পেয়ে গেলেন মার্টিন লুথার কিং। মজা কি জানেন? কিং-এর শত্রুরাই বেশী ঢাক ঢোল পিটিয়ে ঘটনাটার গুরুত্ব অনেক বাড়িয়ে দিলো। এক শ্বেতাঙ্গ মহিলা কিংএর প্রচারপত্র পড়ে রেগে আগুন! কাগজে তিনি আবোল তাবোল যুক্তি দিয়ে আক্রমণ শানাতে চেষ্টা করলেন মার্টিনের বিরুদ্ধে। এতে ফল হলো চমৎকার,—আমাদের আসল অবস্থা নিয়ে সকলে একটু ভাববার সময় পেলে। চিরন্তন ক্রীতদাসের দল আমরা—আজও মুক্তি পাইনি!....

বাস বয়কট আন্দোলন সম্পূর্ণ সফল হলো। সস্ত্রীক গাড়ি করে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলেন মার্টিন। মুখে তার ফুটে ওঠে বিজয়ীর হাসি,—একটি নিগ্রো যাত্রীও বাসে চাপেনি। অথচ, যে কোন স্বাভাবিক দিনে মণ্টগোমারি শহরে সতেরো থেকে আঠারো হাজার নিগ্রো যাত্রী বাসে যাতায়াত করে থাকে।

স্ত্রী করেটাকে ডেকে মার্টিন বললেন: দেশের ডাকে বিরাট দায়িত্ব আমাকে নিতে হবে। পরিবারের দিকে হয়তো আর তেমন নজর দিতে পারবো না।

করেটা হাসলেন: আমি তোমার পাশে আছি। তুমি যা কিছু করবে, তাতেই আমার পূর্ণ সমর্থন থাকবে।....

হাজার হাজার সংগ্রামী নিগ্রো জনতাকে উদাত্ত আহ্বান জানালেন: খ্রীষ্টান সৈনিকগণ, সম্মুখে অগ্রসর হও।....কিং আরো বললেন: 'ভাইসব, হিংসা দ্বারা কিছুই লাভ করা যায় না, যাবেও না। আমরা আমাদের শত্রুদের ভালোবাসবো, তাদের অভিশাপের বদলে

আমরা করবো আশীর্বাদ; ওদের অবজ্ঞাতে অভিমানী না হয়ে সকলের কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করবো।....

যীশুখ্রীষ্ট যা বলেন, গান্ধীজী যা প্রমাণ করে গেছেন, মার্টিন লুথার কিং আবার তাই উচ্চারণ করলেন দিশাহারা নির্যাতিত নিগ্রোদের সংবদ্ধ করে তুলতে।

বাস-কোম্পানীগুলির কাছে মার্টিন তিনটি দাবী পেশ করলেন:

(ক) ড্রাইভারদের কাছ থেকে ভদ্র ব্যবহার;

(খ) আসনে কোন সাদা-কালো সংরক্ষণ চলবে না;

(গ) বাস-কোম্পানীগুলিতে নিগ্রো কর্মচারী নিয়োগ করতে হবে।

এই তিনটি দাবীর ভিত্তিতেই 'বয়কট' এবং যতদিন পর্যন্ত আদায় না হয়, ততদিন এমন অবস্থা চলবে।

কিংকে গ্রেপ্তার করা হলো। তাঁর গ্রেপ্তারের সংবাদে বিক্ষোভে ফেটে পড়ল আমেরিকার সমগ্র নিগ্রো সমাজ। জেল আর কোর্টের সামনে দেয়া হল বিরাট র‍্যালি ও ডেমনেস্ট্রেশান। জেল সুপার আতঙ্কিত হয়ে ওঠেন সেই বিক্ষুব্ধ জনসমুদ্র দেখে। মার্টিনকে তিনি আপন দায়িত্বে মুক্তি দিলেন এবং নিজে তাঁকে কয়েদখানার বাইরে পৌঁছে দিলেন।

কট্টর বর্ণদ্বেষীরা নিগ্রোদের এমন সংগ্রামী চেতনাকে আর বরদাস্ত করতে পারলে না। চোরা গোপ্তা আক্রমণে আহত হতে থাকেন একাধিক নিগ্রো নেতা। বোমা নিক্ষিপ্ত হয় মার্টিনের বাড়ীতে। করেটা তাঁর সদ্যজাত শিশুকে বুকে চেপে ধরে পালিয়ে আত্মরক্ষা করেন।

দারুন উত্তেজনায় ফুঁসতে থাকে হাজার হাজার কালো মানুষ। আগুনের ভাঁটার মতো জ্বলছে তাদের দৃষ্টি। নখর-আক্রমণে এখনই প্রতিশোধ নিতে চায়।

খুন কা বদলে খুন! আর ক্ষমা নয়। ক্ষমা নেই।

কিন্তু ক্ষমা সুন্দর হাসি হাসলেন মার্টিন লুথার কিং। দুটো হাত প্রসারিত করে তিনি দেখালেন, তাঁর হৃদয় কত বড়। বললেন: যীশুকে ভুলে যেও না ভাইসব। তরবারির সাহায্যে যারা বাঁচতে চায়, তরবারির আঘাতেই তারা ধ্বংস হবে। প্রেম দিয়েই আমরা আমাদের শ্বেতাঙ্গ ভাইদের ঘৃণাকে জয় করব।....

কিন্তু কোথায় সেই জয়? প্রাণ দিয়েও মার্টিন পারলেন না আমাদের মুক্তি আনতে। আমরা আজও তেমনি ক্রীতদাস আছি।'

ভারী গলায় মিকি বলেছিল। তার চোখ দুটোতে সম্ভবত সেই মুহূর্তে অনেক জ্বালা চকচকিয়ে উঠেছিল। ১৯৬৮ এর অভিশপ্ত ৪ঠা এপ্রিল এ যুগের এক শ্রেষ্ঠ মানব গান্ধী-তুল্য মার্টিন লুথার কিং প্রাণ হারালেন এক মদগর্বী শ্বেতাঙ্গ যুবকের গুলিতে। আর সেই অবক্ষয়ের বস্তুপিণ্ডের উপর দাঁড়িয়ে লক্ষ লক্ষ নিগ্রো জনতা তাই প্রশ্ন করছে: আর কত দিন? আর কত দিন আমরা এমন শান্তির ছাগশিশু হয়ে থাকবো?...

চাকা ঘুরছে। বন্‌বনিয়ে যুগের ক্রমাগত আবর্তন চলেছে। বোঁ বোঁ জলের পাঁকে কত কে হারিয়ে গেল, আবার কত কে উঠে এলো। উত্থানে-পতনে ইতিহাসকে বড় বিচিত্র বলে মনে হয়। নীচের তলার মানুষ সময় সময় বড় দিশাহারা হয়ে পরে। সমস্তই মনে হয় ধাঁধা। তখন আর হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। যা চরম, যা চূড়ান্ত, তাকেই হাত তুলে সমর্থন জানায়।

তাই সেদিনের কিং-পূজারী মিকি আজ আমেরিকার ব্ল্যাক মুসলীমদের খাতায় নাম লিখিয়েছে। এলিজা মহম্মদের দুর্দ্ধর্ষ অনুগামীদের সাথে গলা মিলিয়ে চিৎকার করে জানিয়েছে: আমি

মানি না। আমি মানি না তোমাদের রাষ্ট্র, এ সমাজ, শান্তির নামে এত সব বুজরুকি। আমি মানি না শ্বেতাঙ্গদের, স্বীকার করি না নিগ্রোদেরও। আমরা মুর,—রক্তে মোদের জেহাদী উত্তাল।

মিকি হয়েছে এখন নূরুল ভ্যালেনটাইন। বাড়ী থেকে, সমাজ থেকে, সে এখন অনেক দূরে। কোরান হাতে মসজিদে যায়। এলিজা মহম্মদের প্রতিটি নির্দেশ নিজেদের অন্তরে গেঁথে রাখে। মিকিকে আর আমি সহৃদয় আবেগে 'ডিয়ার মিকি' বলে ডাকতে পারি না। আবার নূরুল ভ্যালেনটাইন বলে ডাকতে বুকে ব্যথা অনুভব করি। ও আর আগের মতো হাসে না। কথা বলে খুব চিবিয়ে চিবিয়ে। চোখের দৃষ্টিতে আর সেই সরলতা নেই। বরং কেমন যেন ক্রুঢ়তা!

কেন এমন হলো?

মাইকেল ভ্যালেনটাইন হঠাৎ নূরুল ভ্যালেনটাইনে রূপান্তরিত হলো কেন?

॥ দুই ॥

মসলিনের পর্দা সরিয়ে দিয়ে মহর্লোক আমেরিকাকে দেখতে চেয়েছিলাম আমি। তারপর একদিন মরু-ঝড়ের আতঙ্কে বালুতে মুখ গোঁজা উটের মতো অনিবার্য বিপর্যয়ের সন্ধান পেয়েছি।

বিপর্যয় আসছে সব দিক দিয়ে। অবক্ষয়ী সমাজের যে বিরাট ধ্বস নামছে, তা থেকে সাদা বা কালো কেউ আত্মরক্ষা করতে পারবে বলে বিশ্বাস হয় না।…নূরুল ভ্যালেনটাইনের দৃষ্টিতে যে নীলাভ বিষ আমি দেখতে পেয়েছি, কেনেডির দেশকে একদিন তা জর্জরিত করবেই!

মিকি ভ্যালেনটাইন নূরুল ভ্যালেনটাইন হয়ে গেল।

আশ্চর্যের কিছুই নেই। কৃষ্ণ মুসলীমদের ছায়াটা ক্রমশই বিস্তারিত হতে হতে স্বাধীন দুনিয়ার পীঠস্থানকে গ্রাস করে নিতে পারে একদিন। মার্কিন সরকার আগে অতটা সচেতন ছিলেন না; কিন্তু আজ, এই মুহূর্তে এলিজা মহম্মদকে স্পর্শ করতে তাঁর দারুন ভয়,—প্রচণ্ড দাহিকা-শক্তিতে দক্ষিণ যুক্তরাষ্ট্র তবে জ্বলে উঠবে।…

দাসত্ব মুক্তির শতবর্ষ পরেও আমেরিকাবাসী নিগ্রোদের পায়ের নীচে কোন মাটি নেই। ভুলতে হয়েছে তাদের পুরাতনী ঐতিহ্যকে,—সেই গহন আফ্রিকার আরণ্যক উদ্দামতা ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে তারা। আবার নবীন সমাজে তারা সবদিক দিয়েই উপেক্ষিত,—সাদারা সংখ্যায়, শিক্ষায় ও বৈভবে তাদের কণ্ঠরোধ করে আছে। সাদারা যেন সবাই রাজপুরুষ,—কালোদের হুকুম করবার একচেটিয়া অধিকার তাদের আছে। প্রায়ই হত্যাহোলি

অনুষ্ঠিত হয়। ন্যায়ধ্বজী গণতান্ত্রিক সরকার করুণাকম্পিত স্বরে অভয় দেন : বর্ণ বিদ্বেষ এবার মুছে ফেলা হবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সবই পর্বতের মূষিক প্রসবের সামিল। আইন ক'রে কি চরিত্র সংশোধন হয়? না, প্রবণতাকে অন্য খাতে বইয়ে দেয়া যায়? শতাব্দীর অভিশাপ ঝেড়ে ফেলে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে চাইছে নিগ্রোরা। কিন্তু পথ পাচ্ছে না। তাদের হয়েছে উভয় সংকট; না পারছে, অকৃত্রিম নিগ্রো বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে, না পারছে, য়ুরোপ বা মার্কিনী চালের সাথে একাত্ম হয়ে যেতে! এই উভয় সংকটই নিগ্রোদের মেরুদণ্ডের উপর অনবরত হাতুড়ির ঘাঁ মেরে চলেছে।

কিন্তু এটাই একমাত্র সমস্যা নয়।

সমস্যা আরো গভীরে। আমেরিকার নিগ্রোরা আজ স্পষ্টতঃ ছুটি শিবিরে বিভক্ত। একদিকে আছে উচ্চ শিক্ষিত, স্বচ্ছল নিগ্রোরা, —যারা আজ প্রায় সাদাদের সাথে সমান আসনে বসছে, জীবনকে উপভোগ করছে।

অপরধারে রয়েছে দরিদ্র, শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত নিম্নতলার নিগ্রোরা, যাদের সংখ্যা অনেক বেশী, অথচ যারা কোন রকম সামাজিক বা অর্থনৈতিক স্বীকৃতি এ যাবৎ পায়নি। এমনকি, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত নিগ্রোরা পর্যন্ত তাদের ঘৃণা ও উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখে।

একজন মধ্যবিত্ত শিক্ষিত নিগ্রো যুবক কখনো কোন বস্তিবাসী তথাকথিত অশিক্ষিত নিগ্রোর সাথে বাক্যালাপ পর্যন্ত করতে লজ্জা পায়। সাদারা তো চিরদিনই বর্ণবিদ্বেষী; আবার নির্যাতিত কালোদের মধ্যে ছুটো ভিন্নমুখী শাখা পরস্পরের প্রতি ঘৃণায় ও দ্বেষে মুখ ফিরিয়ে আছে।

স্ব-জাতির এমন অবজ্ঞায় নিম্নতলার নিগ্রোরা ক্রমশই মারমুখী হয়ে উঠছে। ওদের বর্তমান নীতি হলো : বুলেট ফর ব্রিকব্যাট। ঢিলের বদলে গুলি। খুনকা বাদলা খুন!

'ঘেটো'র অত্যাচার থেকে গরীব নিগ্রোদের কোন মুক্তি নেই। আর যারা 'ঘেটো' ত্যাগ করে একবার প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে, তারা আর কোনদিন ফিরে তাকায়নি ঘেটোগুলোর দিকে। এটা কী কম জ্বালা!

তথাকথিত নিগ্রো নেতারা মুখে যত ত্যাগ ও সাম্যের কথা বলুন না কেন, নিম্নতলার নিগ্রোদের সাথে তাঁদের যোগাযোগ অতি ক্ষীণ। এমন কি অনেকে নিজেকে নিগ্রো বলে পরিচয় দিতে লজ্জা পান। গরীব, বস্তিবাসী নিগ্রোরাও জানে, তাদের প্রতিনিধি এরা নয়। এরা প্রত্যেকেই সাদাদের সমাজে সম্মান ও স্বীকৃতি আদায়ের জন্য লালায়িত,—স্ব-জাতির জন্য ভাবনার অবসর তাঁদের নেই।

ঘেটোর দুর্বিসহ জীবন যন্ত্রণায় ছটফটিয়ে উঠছে নিগ্রোরা। তারা যেন পশুর চেয়েও অধম, সামাজিক সম্মান তাদের নেই, অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা থেকে একান্তই বঞ্চিত। নরমপন্থী নেতারা তাদের ভুলে গেছেন; কাজেই চরমপন্থী নিগ্রো নেতাদের প্রতিই তাদের আসক্তি বেশী।

জাতীয়তাবাদী···খ্যাতিমান নিগ্রো নেতারা কোনদিন নিগ্রোদের নিয়ে পৃথক কোন রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার কথা চিন্তা করতে পারেন না। তাঁরা সামগ্রিক ভাবে আমেরিকার উন্নতির কথা ভাবেন; এবং মার্কিন দেশের যথার্থ উন্নতির জন্যই নিগ্রো-প্রগতির প্রস্তাব তাঁরা রেখেছেন!

কিন্তু বঞ্চিত নিগ্রোদের ধারণা, তাদের নেতারা ক্রমশই ভুলে যাচ্ছেন 'ঘেটো'র কথা, ভুলে যাচ্ছেন কালো জাতীয়তাবাদের শপথ-বাণীর ইতিকথা, সাদাদের সাথে দহরম মহরমে ওঁদের আত্মতুষ্টি খুব,—পিছিয়ে পড়া নিঃস্ব ভাইবোনদের স্মৃতি আর মনকে দোলা দেয় না।

এমনি অভিমানেই মার্কিন দেশের নিগ্রো সমাজে বিরাট ফাটল

ধরেছে। কবে যেন সবার অলক্ষ্যে প্রচণ্ড ভূকম্পন হয়ে গেছে, এখন সেই ফাটল দিয়ে রক্তোভ লাভা বের হচ্ছে অনবরত।

নীচুতলার নিগ্রোরা আজ তাই এক পৃথক সত্ত্বা নিয়ে বাঁচতে চাইছে। তারা ক্রমশই আলাদা হয়ে যাচ্ছে—সৃষ্টি করছে নতুন সামাজিক, নৈতিক ও ধর্মীয় পরিমণ্ডল। তাদের প্রতি এতকাল যে অমানুষিক ঘৃণা ও অবজ্ঞা দেখানো হয়েছে, রুদ্ধ অভিমানে তারা তাব বদলা নিতে চায়।

এই বদলা নেবার প্রেরণা পাচ্ছে তারা জর্জিয়ার ইসলাম ধর্ম প্রচারক এলিজা মহম্মদের কাছ থেকে। এলিজার অনুগামীরাই 'কালো মুসলীম' (Black Muslims) নামে পরিচিত। মার্কিন ইতিহাসে এক ঘূর্ণি-ঝড় তুলতেই যেন এলিজার আবির্ভাব, আর সেই ঝড়ের তাণ্ডবে কঠিন প্রতিশোধের প্রতিজ্ঞায় যূথবদ্ধ কালো মুসলীমের দল। আমেরিকার শ্বেতাঙ্গ সমাজ তাদের ভীতির দৃষ্টিতে দেখে, উঁচুতলার নিগ্রোরা আরো দূরত্ব বজায় রেখে চলে এবং গোয়েন্দা বিভাগ অত্যন্ত সন্ত্রস্ত এদের নিয়ে।

এলিজা মহম্মদের কালো ছায়া কালবৈশাখীর মেঘের মতো আমেরিকার আকাশে এক কোণে দেখা দিয়েছে। ভয় হয়, ঐ মেঘ হয়তো একদিন অনিবার্য ঝড়ের সঙ্কেত নিয়ে আসবে। তেমন সম্ভাবনা ইতিমধ্যেই দেখা দিয়েছে।

শিকাগোতে দু'চারজন ব্ল্যাক মুসলীমকে আমি দেখেছি। অত্যন্ত কঠিন চোখ-মুখ ওদের। সাধাবণ নিগ্রোদের মতো খোলা মেলা নয়। খুব চাপা, কিন্তু ক্ষেত্র বিশেষে বেপরোয়া। আশি থেকে এক শ' মাইল স্পিডে গাড়ি চালিয়ে বেড়ায়। ট্রাফিক সিগন্যালকে থোরাই কেয়ার করে। কেয়ার ওরা কাউকেই করে না,—মার্কিন আইন-কানুন, সংবিধান সমস্তই মূল্যহীন এদের কাছে। ওদের একমেবা দ্বিতীয়ম্ নেতা হলেন এলিজা মহম্মদ। তিনিই ধর্মগুরু, তিনিই রাষ্ট্রগুরু, তাঁর প্রতিটি কথাই আইন।

কেনেডি, জনসন বা নিক্সনের কথায় কর্ণপাত করবার মানুষ এরা নয়।

এলিজা মহম্মদ কে? কি তাঁর নীতি? কেনই বা হু হু করে তাঁর অনুগামীর সংখ্যা বেড়ে চলেছে? সরকার তাদের এমন ভয় করেন কেন?…মিকি ব্ল্যাক মুসলীম হবার পর এত সব প্রশ্ন আমার মনে উদয় হয়েছে। অনেক চেষ্টা করেছি কালো মুসলমানদের ঘণিষ্ঠ হতে। কিন্তু বাধা পেয়েছি। ওদের সমাজে প্রবেশের দ্বার কখনো খোলা পাইনি। তবু কখনো সখনো মিকিকে একলা পেলে পাকড়াও করেছি। অনেক প্রশ্ন করেছি। ও বিরক্ত হয়েছে, তবে রূঢ় হয়নি। আমার প্রতি ওর হয়তো একটা দুর্বলতা ছিল। তাই অনেক প্রশ্নের জবাবও পেয়ে গেছি।…

এলিজার প্রভাব অসাধারণ। কালো মুসলীমদের কাছে তিনি অবতার। আল্লার পাঠানো দূত। বেহেস্ত থেকে নেমে এসেছেন, কালোদের মুক্তির বাণী শোনাবার জন্য।

টেলিভিসনের কাঁপা পর্দায় এলিজা মহম্মদকে আমি বিচরণ করতে দেখেছি। সাধারণ নিগ্রো চেহারা। কিন্তু দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা ও গভীরতা ভুলবার নয়। কণ্ঠস্বর চাবুকের মতো। হাজার হাজার শিষ্য বুইক, শেভ্রোলেট, মার্সিডিস, ফোর্ড নাম্বার ওয়ান, ক্যাডিলাক …ইত্যাদিতে চেপে ছুটে আসছে তাঁকে দেখতে। অস্ফুট গুঞ্জন ওঠে: He is the last Messenger of Allah.

পবিত্র কোরানে লিখিত আছে: হজরত মহম্মদই আল্লার প্রেরিত শেষ দূত। কিন্তু কালো মুসলীমরা বিশ্বাস করে: এলিজা মহম্মদই আল্লা প্রেরিত শেষ পয়গম্বর।

কালোদের আরো বিশ্বাস,—এই এলিজা মহম্মদই একদিন আমেরিকাবাসী নির্যাতিত সমস্ত কালো মানুষকে ইসলামের নামে ঐক্যবদ্ধ করতে পারবেন। এদের আন্দোলন নতুন নয়; তবে এতকাল প্রায় নীরব ছিল, ইদানীং সোচ্চার হয়ে উঠেছে। আগে

এতটা সংঘবদ্ধতা ছিল না, কিন্তু এখন এলিজার নেতৃত্বে তারা এক অপ্রতিহত শক্তিতে পরিণত হয়েছে।

ব্ল্যাক মুসলীমদের গোড়ার কথা বলতে গেলে পিছিয়ে যেতে হবে কয়েক দশক অতীতে,—প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী ঘটনাবহুল কালে। উপলাহত নদীর তীব্রতা নিয়ে মার্কিন মুলুকে আর্বিভূত হয়েছেন এক ইসলাম প্রচারক। নাম তাঁর ডব্লু. ডি. ফ্রাড (W. D. Frad)। ফ্রাডকে ঘিরে অনেক রহস্য-গাথা, অনেক কিংবদন্তী। কিংখাবে মোড়া দামাস্কাস তলোয়ারের মতো তাঁর চেহারা। কণ্ঠস্বরে যেন নানা স্বরগ্রাম ওঠা নামা করে। অনুগামীরা প্রচাব করে থাকে: মহামানব ফ্রাড তো আমেরিকাব মানুষ নন। উনি এসেছেন ইসলাম ধর্মের পীঠস্থান আরব থেকে।

১৯৩২-৩৩এ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক বনিয়াদ যখন প্রায় ভেঙ্গে পড়েছে, ডব্লু. ডি. ফ্রাডের উত্থান সেই সময়েই। ডিপ্রেশনের করাল ছায়া নেমেছে দেশের উপর, জিনিসপত্রের দাম হু হু করে নেমে যাচ্ছে, অথচ লোকের ক্রয় ক্ষমতা নেই। বুভুক্ষুদের হাহাকার, বেকারিত্বের জ্বালা, রিকেটি শিশুর কান্না,—ধনকুবের আমেরিকা আগে কখনো অমন তিক্ত দারিদ্র্য ভোগ করেনি।

সবচেয়ে দুরবস্থা হয়েছিল নিগ্রোদের। রুটির সন্ধানে তারা বিলাপরত, অভাবের তাড়নায় তারা ক্ষিপ্ত।

ঠিক সেই সময়ই ফ্রাড তাদের ইসলামের নামে ঐক্যবদ্ধ হতে আহ্বান জানালেন। সাড়া পাওয়া গেল বেশ। প্রায় আট হাজার নিগ্রো তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করল। এই ভাবেই উৎপত্তি হলো আমেরিকার কৃষ্ণ মুসলীম সমাজ।

জানিনা, আমেরিকার আগামী ইতিহাসে এরা কোন স্বাক্ষর আঁকবে। তবে এই মুহূর্তে আশঙ্কিত হবার কারণ আছে। ওদের দুর্দ্ধর্ষ সংগঠনগুলি ভয়ানক বেপরোয়া। খৃষ্টান ধর্মাবলম্বীদের ওরা

সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখে। সাদাদের দিকে খুনীর দৃষ্টি নিয়ে তাকায়। বিদেশীদের সাথে প্রায় বাক্যালাপই করে না।

একবার এক কৃষ্ণ মুসলীম নেতার সাথে দেখা করতে গিয়ে অপমানিত হয়েছিলাম। নাম তাঁর মহম্মদ বেথুলা। শুনেছিলাম, এলিজা মহম্মদ নাকি তাঁকে যথেষ্ট প্রীতির দৃষ্টিতে দেখেন। আমার ইচ্ছে ছিল, বেথুলাকে ধরে এলিজা মহম্মদের ব্যক্তিগত জীবন যাপন সম্পর্কে একটা ধারণা করে নেবো।

মহম্মদ বেথুলা অবশ্য শিকাগোর বাসিন্দা ছিলেন না। তিনি থাকেন মিলওয়েকী শহরে। স্থির করলাম, মিলওয়েকী যাবো বেথুলার ইন্টারভিউ নিতে। অনেক কাজের মধ্যেও সময় করে নিতে হবে। মন তখন রোমাঞ্চে মেতে উঠেছে। সারাটা দিন ও রাত্রির নিটোল কাজের ঠাস বুনোনিতেও কখনো হাঁপিয়ে উঠি না।

একাই চললুম। শিকাগো থেকে মিলওয়েকী। লিংকন এ্যাভিনিউর বাসিন্দা মহম্মদ বেথুলাকে চেনে সবাই। প্রসাদপম অট্টালিকা। সামনেই অনেকটা খোলামেলা বাগান। নগরের মধ্যে বাস করেও নাগরিক স্পর্শ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। মাঝে মাঝে অখণ্ড নীরবতা খান খান হয়ে যায় হাউণ্ডের ভারী গলার আওয়াজে। বাগানের মধ্যে পায়ে চলা ও গাড়ীচলা রাস্তা সোজা বারেন্দায় গিয়ে মিশেছে। সোনালী সবুজ ক্রোটন ঝাড় সেই পথের দু'ধারে। চারিদিকে বড় বড় রেইনট্রি আর পামগাছগুলো আকাশের মুখ ঢাকা দিয়ে আছে। সামান্য বাতাসে ঘন পুত্রারণ্যে হিস্ হিস্ শব্দ।

গাড়ী নিয়ে সোজা ঢুকে পড়লাম সেই মনোরম আবাসে। একগুচ্ছ রক্তাভ রড্রেনডো কোথা থেকে যেন বাতাসের হিল্লোলে আমার গাড়ীর উপর এসে আছড়ে পড়ে।

প্রথমেই যার সম্মুখীন হলাম, সে সেই বাড়ীর নিগ্রো সেন্ট্রি।

পাথরে খোদাই বলিষ্ঠ চেহারা। ভারী বুট ঠুকে এগিয়ে এলো সে। জানতে চাইলো, আমি কে এবং কিসের জন্য আমার এখানে আগমন।

আমার উদ্দেশ্য শুনে তার ঠোঁট দুটো বিকৃত হয়ে আসে। আমাকে বাড়ীর ভিতরে ঢুকতে নিষেধ করে। আমি স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে থাকি। ও তড়িৎ গতিতে ভিতরে চলে যায়।

একটু পরেই যিনি এলেন, তিনি নিঃসন্দেহে মহম্মদ বেথুলা নন। কারণ আমি শুনেছিলাম, বেথুলার লম্বা দাড়ি আছে এবং তাঁর বয়স পঞ্চাশের কম নয়। কিন্তু আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন বছর পঁচিশের এক শীর্ণ নিগ্রো যুবক,—দাড়ি-গোঁফের বালাই নেই, হাতে একটি পেন্সিল ও একটি খাতা।

আাম একটু সপ্রতিভ হবার চেষ্টা করি: আমি মহম্মদ বেথুলার সাক্ষাৎপ্রার্থী।

যুবকের দৃষ্টিতে কুঞ্চন দেখা দেয়: আপনি বিদেশী?

: আমি ভারতীয় ছাত্র।

: প্রভু আপনার মতো বিদেশী ছোকরার সাথে আলোচনায় সময় নষ্ট করতে চান না।

কে যেন চাবুক মারলো আমাকে। কান দুটো অপমানে ঝাঁ ঝাঁ করতে থাকে। গলার ভিতরটা শুকনো ও তেতো মনে হয়। অনেক কষ্টে জিহ্বা সংযত করে নেই। নিঃশব্দে ফিরে আসি। চোখের সামনে একটি প্রত্যাশার অপমৃত্যু হতে দেখলুম। কালো মুসলীমদের প্রতি আমার কৌতূহল ও রোমাঞ্চবোধ ছিল, কিন্তু কোন সন্দেহ বা ঘৃণা ছিল না। কিন্তু মহম্মদ বেথুলার ব্যবহার কালো মুসলীমদের প্রতি আমার মনোভাবকে তিক্ত করে তুললো।

মিলওয়েকী থেকে আবার ফিরে এলাম শিকাগোতে। অভিমান জর্জরিত মন। ইচ্ছে হয়, মহম্মদ বেথুলাকে আক্রমণ করে কোন

সংবাদপত্রে চিঠি প্রকাশ করতে। আবার ভয়ও হয়, কালো মুসলীমরা রেগে গেলে শ্বাপদের চাইতেও ভয়ানক,—সাগরপারের দেশে হয়তো আমি খুন হয়ে যেতে পারি।

আমি শুধু সুযোগ খুঁজতে থাকি, কবে দেখা পাই মিকির। দেখা অবশ্য পেলাম দিন দশকের মধ্যেই। এক ফলের দোকানে আপেল কিনছিল সে। ইদানীং তার অবস্থা পাল্টিয়েছে; শিকাগোর এক মসজিদে আজান দিয়ে পয়সা পায় কম নয়। এলিজা মহম্মদ তাঁর কোন শিষ্যকেই দারিদ্র্যের পেষণে নষ্ট হয়ে যেতে দিতে রাজি নন। কালো মুসলীমদের মধ্যে রয়েছে আশ্চর্য সংঘবদ্ধতা,—শত্রুকে ঘায়েল করতে তারা সর্বদাই যূথবদ্ধ।

মিকিকে ধরে সেদিন দোকানের সামনেই বেশ কয়েক কথা শুনিয়ে দিলাম: অতি অভদ্র তোমাদের ঐ বেথুলা। আমি বিদেশী বলে বাড়ীতেই ঢুকতে দিলো না, দেখা করা দূরের কথা।

আমার কথায় মিকির অস্থিরতা বেড়ে যায়। বা হাতখানা তুলে থামিয়ে দিতে চাইলো আমাকে: বেথুলা অন্যায় কিছু করেননি।...আজকাল বিদেশীরা আমাদের ইন্টারভিউ নিয়ে বাইরের জগতে বিকৃত সমস্ত তথ্য প্রচার করে বেড়ায়। অথচ, আমাদের মনের গভীরে কেউ-ই ঢুকতে পারে না। বেথুলা তাই বিদেশী শুনলেই খুব রেগে যান।

মিকি আবার হারিয়ে গেল। নুরুল ভ্যালেনটাইন হবার পর থেকে ও আর আগের মতো স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস নিয়ে আমার সাথে কথা বলে না। দু'জনের মাঝে এক লবণাক্ত সমুদ্রের আছাড়ি-পিছাড়ি চলেছে প্রতিনিয়ত।

মিকির এই রূপান্তর ও ভাবান্তর দেখলে আমার চোখে জ্বালা অনুভব করি। বার বার অতীতটাই বড় হয়ে ওঠে। পিছনের ফেলে আসা ছবিগুলি ভেসে আসতে থাকে।

শিকাগোর জালিকাটা রোদ, লস এন্‌জেলসের শন শন বাতাস আর রিভার সাইডের মেঘমেদুর ছায়ায় আমরা দু'জনে কী কম ঘুরেছি! বেশীর ভাগ সময়ই আমি দেখেছি, মিকি হাসছে,—ওর ঝকঝকে ধারালো হাসি আমাকে মুগ্ধ করতো। কিন্তু অভিমানের মুহূর্তে ওর দৃষ্টি সজল হয়ে উঠবার বদলে অগ্নিঝরা হয়ে উঠতো। একবার বলে উঠেছিল : শান্তি নেই। তাই অপরকে শান্তিতে থাকতে দেখলে গা জ্বালা করে।

মিকির কথায় ভয় হয়েছিল আমার। ওর হাসির অন্তরালে যে এতখানি লবণাক্ত স্রোত বইছে, বুঝতে পারিনি। মিসেস ব্লেকের নগ্ন দেহ প্রতিদিন দেখতে দেখতে বুঝি বিকার ধরে গেছে মিকির। যৌবন সুলভ মোহ নিয়ে কোন নিগ্রো যুবতীর দিকে ফিরেও তাকায় না।

: আমাদের বাড়ীতে যাবেন? মিকি একদিন জিজ্ঞাসা করেছিল।

: সানন্দে।

: আমরা কিন্তু খুব গরীব। ঘৃণা করবেন না।

: আমি নিজে এক দরিদ্র দেশের লোক। তাই বঞ্চিত মানুষদের সমব্যথী বলে মনে হয়।

আমার কথায় মিকি খুব খুশী হয়েছিল। রিভার সাইডের শান্ত কুঞ্জে নিয়ে চললো আমাকে। যাবার পথে একদল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলে-মেয়েদের দেখলাম। এক চিলতে মাঠের উপর গড়াগড়ি জড়াজড়ি করে চলেছে। পোশাকে মেয়েদের একান্ত অনীহা, ছেলেগুলির চলাফেরায় নিতান্তই শিথিল ভাব।

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে মিকি হাসলে : এরা কিন্তু ভারতীয় যোগ সাধনার বড় ভক্ত! তুরীয় মার্গে বিচরণ করতে অভ্যস্ত। গাঁজা চরসে দম দেয়, হিপি—কমিউনে ছেলে-মেয়ের অবাধ সহ-অবস্থান চলেছে, একটু নির্জন পাহাড়ী উপত্যকা পেলেই দিগম্বর

উপনিবেশ স্থাপন করে। এই তো সভ্যতা! এর চেয়ে এলিজা মহম্মদের শিষ্যত্ব নিলে তবু পায়ের নীচে মাটি পাওয়া যায়।

সেই প্রথম মিকির মুখে এলিজা মহম্মদের নাম শুনেছিলাম। কিন্তু তখন অতটা গুরুত্ব দেইনি। আজ বুঝি, আসলে মিকির চাপা অন্তর্দ্বন্দ্বে চরমপন্থী বেপরোয়া দর্শনটাই ধীরে ধীরে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছিল। সে চাইছিল, এমন কিছু একটা করতে যার দ্বারা এই দেশ ও সামাজিক ব্যবস্থার প্রতি তীব্র ঘৃণা ও বিদ্বেষ জানানো যায়। মিকির মনে হয়েছিল, এলিজা মহম্মদই পারেন সেই পথের সন্ধান দিতে।...

শিকাগো থেকে কালিফরনিয়ার রিভার সাইড শহরে আসতে হলে অনেকগুলি বড় বড় শহর ও শহরতলি পেরিয়ে আসতে হয়। মিকিকে অনুসরণ করে আমিও তাই পেরিয়ে এলাম আইওয়া, নেবরাস্‌কা, ওয়াওমিং, উতা, নেভাদা ইত্যাদি। তখন আমি পুরোপুরি পর্যটক। আর পর্যটকের দৃষ্টি অন্য মানুষের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। আপন আনন্দে, স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গিতে সবকিছু যাচাই করে নেবার চেষ্টা করি। রকি পর্বতের সৌন্দর্যে তন্ময় হয়ে গেলাম। সেই পাহাড় ধরে অনুসরণ করতে গিয়েই সান্‌ফ্রান্‌সিস্‌কোর পদপ্রান্তে সুনীল জলধির সন্ধান পেলাম। গোল্ডেন্‌ ব্রিজের উপর দাঁড়িয়ে ঝুঁকে দেখতে লাগলাম সমুদ্র। দমকা বাতাসে আমাদের অবিন্যস্ত চুল নর্তন করতে থাকে। দুটো ডেস্‌ট্রয়ার প্রবল শক্তিতে জলে আলোড়ন তুলে ঢুকে পড়েছে সান্‌ফ্রান্‌সিস্‌কোর জেটিতে। নিজের সমস্ত স্বপ্ন-কল্পনাকে ঢেলে দিয়ে পল রবসনের গান ধরলো মিকি। আমার মনে হলো, রবসনের গান নিগ্রোরা যতটা দরদ দিয়ে গাইতে পারে, অন্য কেউ ততটা পারে না।

অনেকক্ষণ সমুদ্রতীরে বসে থেকে দু'জনে উঠে দাঁড়ালাম। গোধূলির স্পর্শে দিগন্ত ফাগ-রক্তিম। চির বসন্তের আবাস সান্‌ফ্রান্‌সিস্‌কো। ন্যুইয়র্ক যখন শীতে থরহরি কম্প যায়,

সান্‌ফ্রান্‌সিস্‌কোর লোকেরা তখনো স্বল্প পোষাকে রাত-গভীরে যত্রতত্র ঘুরে বেড়ায়; আবার ন্যুইয়র্ক যখন প্রচণ্ড তাপদগ্ধ, সান্‌ফ্রান্‌সিস্‌কোর লোকেরা রোদ্দুরে পিঠ দিয়ে আমেজ আনবার চেষ্টা করে।...

অনেক ঘুরে রিভার সাইডে পৌঁছলাম।

সময় যতদূর মনে পড়ে জুনের মাঝামাঝি, ১৯৬৫; মিকিদের আবাস দেখে বিস্মিত না হয়ে পারি না। এর চেয়ে যে বর্ধমানের কাঞ্চননগরের রিফিউজি-কলোনীর অবস্থা অনেক ভালো। প্রতিটি বাড়ি নড়বড়ে, অন্ধত্ব ও পঙ্গুত্ব নিয়ে হাঁটু ভেঙ্গে পড়েছে। প্রদীপের নাচেই অন্ধকার,—ধনকুবের আমেরিকায়ও যে দারিদ্র্য কত ভয়াবহ, এই সমস্ত নিগ্রো-পল্লীতে না এলে তা ধারণা করা যায় না।

মাথা নীচু করে ভ্যালেনটাইনের ঘরে ঢুকতে হলো। প্রথমেই আমার সাথে পরিচয় হয় মিকির বাবা আর্থারের সাথে। বার্ধক্যের ভারে ভাঙ্গা-চোরা শরীর, উল্টোকুঁজো দেহ, কোকরানো চুল আর একটিও সাদা নয়। ভ্রূ কুঁচকে বুড়ো আমাকে দেখতে থাকে, তারপর একগাল হেসে বলে: গায়ের রঙ আমাদের মতো কালোই বটে। শরীরে নিগ্রো-রক্ত আছে নাকি?

এ প্রশ্নের আর কি জবাব দেবো? হেসে বললাম: থাকতে পারে।

মিকি বলেছিল, তার বাবা নাকি প্রথম বয়সে বলিভিয়ায় ছিল। চ্যাকো যুদ্ধের সময় পালিয়ে আসে আমেরিকায়,—আস্তানা নেয় এই শান্ত শহর রিভার সাইডে। দু' দুটো মহাযুদ্ধের সাক্ষী সে। নিজের জীবন শিক্ষা দিয়ে উপলব্ধি করতে পেরেছে যুদ্ধ কেন হয় এবং কাদের স্বার্থে হয়! ..

রাত তখন অনেক। ভ্যালেনটাইন পরিবারের একাত্ম হয়ে বৃদ্ধ আর্থারকে ঘিরে বসে আছি। আর্থার তার স্মৃতি হাতড়ে

বলিভিয়ার চ্যাকো যুদ্ধের মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা তুলে ধরেছে আমার সামনে :

···চ্যাকো যুদ্ধে বলিভিয়ার নিগ্রোরা খুব জড়িয়ে পড়েছিল। তোমাদের দেশ ভারতবর্ষ তখনও স্বাধীন হয়নি। তাই এই যুদ্ধেব ঢেউ বোধহয় তোমরা অনুভবই করতে পারোনি।·· আর তোমার তো তখন জন্মই হয়নি।

যুদ্ধ লেগেছিল গ্রাণিচ্যাকো প্রদেশ নিয়ে। একদিকে বলিভিয়া আর একদিকে প্যারাগুয়ে। দুটি রাষ্ট্রই তাদের নিগ্রো যোদ্ধাদের ঠেলে পাঠালে চ্যাকো দখল নিতে। ফলে হলো ভয়াবহ রক্তারক্তি। নিগ্রোর হাতে নিগ্রোর মৃত্যু। ভাইয়ের হাতে ভাইয়ের রক্তপাত।

যুদ্ধ যত ছড়িয়ে পড়ে উত্তর আমেরিকাব অস্ত্রব্যবসায়ীদের উল্লাস ততই বেড়ে চলে। তুঙ্গে তাঁদের বৃহস্পতির নর্তন শুরু হয়। আসলে যুদ্ধ তো ব্যবসায়ীদের স্বার্থে। বলিভিয়ার তেল, সোনা আর টিনের উপর শকুনের দৃষ্টি পড়েছে। তাই ওখানে একটি পুতুল সরকার বসিয়ে অনবরত সীমাবদ্ধ যুদ্ধের পায়তাড়া কষে চলেছে উত্তর আমেরিকার মহাপ্রভু। চ্যাকো যুদ্ধে যার শুরু, আজও তার সমাপ্তি ঘটেনি।

সেই যুদ্ধের সময় আমি প্রথম দেখেছিলাম, এরোপ্লেন থেকে কী ভাবে বোমা ছোঁড়া হচ্ছে। বিষাক্ত গ্যাসে হাজার হাজাব মানুষ কেমন দমবন্ধ হয়ে মারা যায়; কী ভাবে পাইপের আগুনে কৃষক ও শ্রমিকদের পল্লীগুলি পুড়ে ছাই হয়ে গেলো। আমার আপন ভাই, আঠারো বছরের জনীকে হারাতে হলো সেই যুদ্ধে। ও ছিল খুব তাগড়া চেহারার,—বলিভিয়ান সরকার তাই ছিনিয়ে নিলে, ঠেলে পাঠালে যুদ্ধ-সীমান্তে। একমাসের মধ্যেই খবর পেলাম পিলকোমায়ো নদীর জল লাল হয়ে উঠেছিল বুলেটবিদ্ধ জনীর রক্তে।···

আর্থারের স্মৃতি-কথন শেষ হয়।

কানের দু' পাশে নিশিপোকার গুঞ্জন। রুবিড্রো পাহাড়কে টপকে সামুদ্রিক বাতাস এসে ঝাপটা মারছে আমাদের। নেশাগ্রস্ত কটি মানুষের মতো নিশ্চল বুঁদ হয়ে বসে আছি আমরা,—বুড়ো আর্থার, মিকি, মিকির বোন কেটি এবং আমি। অন্ধকারেও অনুভব করতে পারি, কেটির দুটি ক্ষুধার্ত চোখ আমাকে লেহন করছে। সেই দৃষ্টির প্রত্যাশা সহ্য করা যায় না, বুক কাঁপে।···

জীবনে সেই প্রথম এবং সম্ভবতঃ শেষ একটি নিগ্রো পরিবারে রাত কাটালাম। নড়বড়ে তক্তপোশের উপর নীল রঙের জাজিম বিছানো শয্যা। শিয়রে দু' বেটারী পেন্সিল টর্চ নিয়ে আমি খুব সতর্ক,—এ অঞ্চলে রেটল সাঁপের নাকি খুব উৎপাৎ। এ ঘরটিই বোধহয় ভ্যালেনটাইন-পরিবারের শ্রেষ্ঠ ঘর; কিন্তু এত স্যাৎসেঁতে। ঘরময় সোঁদা গন্ধ। নিগ্রো পরিবারের খাবারও তেমন রুচিকর মনে হয়নি। খাবাব অবশ্য খুবই সামান্য,—পরেজ, রুটি, মাখন, সুপ, আলুসিদ্ধ, এক টুকরো পাই এবং খানিকটা মনের তৃপ্তি মেটাতে থ্রি এক্স রাম। খেতে খেতে আমি লক্ষ্য করছিলাম, কেটি সোডা ছাড়াই রামটুকু গলায় ঢেলে দিল। তারপর আমার মুখের দিকে তাকিয়ে অহেতুক হেসে উঠলো।···

বাইরে নিকষ অন্ধকার। দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে গেছে মিকি। জানালা দিয়ে সীমাহীন নক্ষত্রখচিত আকাশ দেখা যায়। দেশ থেকে সপ্তাহখানেক আগে দুটো চিঠি পেয়েছি। একটি আমার মার,—সমস্ত চিঠি জুড়ে আমার মঙ্গল কামনা। আর একটি আমার প্রথম জীবনের প্রেয়সী বুলটীর—নানা রকম অছিলায় বিপথে না পড়ে সুপথে থেকে সুবোধ বালকের মতো ফিরে আসবার আব্দার জানিয়েছে। দু' জনের কথাই মনে পড়ছিল। আনন্দ হচ্ছিলো, পৃথিবীটা যেন প্রায় আমার হাতের মুঠোয়।···

হঠাৎ দরজায় ‘খুট’ করে শব্দ হলো।

আমার প্রতিটি ইন্দ্রিয়কে সচেতন করে তাকাই। ভয়ানক চমক লাগে;—একটি নারী মূর্তি এসে দাঁড়িয়েছে দোর গোড়ায়। আমার বুকের মধ্যে যেন হাতুড়ি পিটতে থাকে কেউ। অনেকগুলি ধাবমান অশ্ব ছুটে যায় আমার মগজের মধ্য দিয়ে।

ছায়া মূর্তি,—কেটি। নিঃসন্দেহে সেই শীর্ণা নিগ্রো যুবতী। কেটি আমার মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে,—আমি তখনও নিশ্চল। আমার হাত ধরে ঝাঁকুনি দেয়ঃ এই বিদেশী!

এবার উঠে বসতে হলো। ভয়ার্ত গলায় জিজ্ঞাসা করি: কী চাও?

কেটি আমার গালে টোকা দিয়ে বলেঃ বাইরে চলো,—মাঠে দাঁড়িয়ে আমার নাচ দেখবে। মাত্র ষাট সেণ্ট লাগবে। রাজি তো?

আমি ঘামতে থাকি। একী প্রহেলিকা! মিকির বোন আমাকে নাচ দেখিয়ে পয়সা নেবে! মিকি জানতে পারলে আমার সম্পর্কে তার সমস্ত ধারণাই বদলে যাবে!

কাঁপা গলায় বললামঃ নাচ দেখাতে হবে না। আমি তোমাকে বরং ষাট সেণ্ট দিচ্ছি।

কেটি আমার গা ঘেঁষে বসে পড়েঃ তা হয় না বন্ধু, আমি ভিক্ষে নিতে পারবো না। তুমি দেখো, আমার নাচ তোমার ভালো লাগবে।

হঠাৎ নীচু হয়ে আমার চোখের দিকে তাকায় কেটি। প্রায় ফিসফিসিয়ে ওঠেঃ তুমি ভয় পেওনা বিদেশী। আমি তোমাকে দেহ দিতে আসিনি। একটুখানি নাচ দেখা দোষের কিছু নয়।

ঃ কিন্তু তোমার ভাই—

আমি শেষবারের মতো যুক্তি দেখাবার চেষ্টা করি।

ঃ আমার ভাই, বাবা সবাই জানেন, বাড়ীতে কোন আগন্তুক এলে কেটি তাকে আনন্দ দেবেই।…

সেদিনের সেই আশ্চর্য রাতে বাইরে বাগানে ঘুরে ঘুরে কেটি তার নাচ দেখিয়েছিল। আমি মোহাচ্ছন্নের মতো বিস্ফারিত দৃষ্টিতে দেখছিলাম,—নাচতে নাচতে কেটি ওর দেহের সমস্ত আবরণকেই মুক্তি দিয়েছে। আবাক হয়ে দেখলাম,—রুগ্ন শরীরের অমন দোলমার মতো বুক কী করে হয়! আন্দোলিত নিতম্বের প্রসারতাও কল্পনা করা যায় না। নাচতে নাচতেই কেটি বলছিল ঃ বন্ধু, আমাকে ছুঁয়ো না। তুমি চাইলে আমি 'না' করতে পারবো না। কিন্তু শেষে হলিউডেব বাবুদেব মতো দুষ্ট রোগ তোমায় পেয়ে বসবে!

রোগের ভয়েই হোক, বা ভারতীয় সততায় হোক, সে রাতে কেটির নগ্ন দেহের গভীরে আমি ডুব দেইনি। পুরো একটি ডলার ওর হাতে গুঁজে দিয়ে কোন রকমে টলতে টলতে বিছানায় ফিরে এসেছি। মাথার কোষে কোষে দাবানল। ইচ্ছে হয়েছিল, পালিয়ে যাই। কিন্তু নিজেকে সংযত রেখেছি। ক্রমশঃ সুস্থ হয়ে এলে ভাবলাম, আজ আমি যা প্রত্যক্ষ করলাম, তা অবক্ষয়ী ধনতন্ত্রবাদের একটি দিক মাত্র। হলিউডের পাশে সুন্দর বিভারসাইড; আর সেই রিভার সাইডে কেটির মতো অসহায়া নিগ্রো যুবতীরা মাত্র ষাট সেন্টের বদলে নগ্ন নাচ দেখাচ্ছে, একটা ডলারের পরিবর্তে অঙ্কশায়িনী হতে রাজি,—যৌন রোগের বিজ উড়ে বেড়াচ্ছে এখানকার আকাশে-বাতাসে!…

ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

ঘুম ভাঙ্গলো ব্যাণ্ড পার্টির শব্দে। কারা যেন মার্চ করে যাচ্ছে এ বাড়ীরই পাশ দিয়ে। জানালা খুলে ঝুঁকে পড়ি। দেখতে পাই

এক বিচিত্র দৃশ্য: শত শত সশস্ত্র কৃষ্ণ মুসলীম সামরিক শৃঙ্খলায় মার্চ করে এগিয়ে চলেছে। ওদের পদভারে যেন পৃথিবী কাঁপছে। নাকাড়া বেজে উঠছে,—ডিম···ডিম···ডিম···। ওয়াশিংটন পার্কের গাছগুলিতে ঝড়ের মাতন লেগেছে। কাকচক্ষু ডোহা লেকের জলকে দূর থেকে মনে হলো, রক্তের মতন লাল। সত্যই বুঝি এক রক্তক্ষয়ী সম্ভাবনায় ড্রাম বেজে চলেছে, নাকাড়া ধ্বনিত হচ্ছে, শত শত সশস্ত্র কৃষ্ণ মুসলীম মাটি কাঁপিয়ে এগিয়ে চলেছে।

আমার পাশে দাঁড়িয়ে আত্মকথনের সুরে বলে উঠলো মিকি: Splendid! Yes, this is remedy!

॥ তিন ॥

ডঃ শীলাবতী রাও আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন। ওঁর হাই পাওয়ার চশমার আড়ালে বুদ্ধিদীপ্ত চোখ দুটি আশ্চর্য সুন্দর। আজ বয়স হয়েছে,—প্রায় প্রৌঢ়া। বছর পনেরো আগে সিস্টার টিউটরের ট্রেনিং নিতে এসেছিলেন শিকাগোতে। আর ফিরে যাননি। চিকিৎসা শাস্ত্রে ডিগ্রি নিয়ে জমজমাট পশার করেছেন! বিশেষতঃ স্ত্রী রোগে তাঁর হাত যশ খুব।

প্রবাসী ভারতীয় বলেই তাঁর সাথে দেখা করতে গিয়েছিলাম। কথায় কথায় জানালাম নিজের স্বল্পকালীন অভিজ্ঞতার কথা এবং মাইকেল ভ্যালেনটাইনের কাহিনী।

ডঃ শীলাবতী আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন। তারপর বলে উঠলেন : বিদেশে এসে নিজেই নিজের আশ্রয় হতে হয়। আর স্থানীয় সমস্যায় নিজেকে জড়িয়ে না ফেলাটাই বুদ্ধিমানের কাজ।

আমি অপ্রতিভ হয়ে বলি : স্থানীয় কোন সমস্যায় নাক গলাতে চাইছি না। কিন্তু ব্ল্যাক মুসলীমদের সম্পর্কে কিছু তথ্য সংগ্রহ করতে চাই। ছোট বেলা থেকেই একটু আধটু সাহিত্যে হাত আছে। ভাবছি, আমেরিকা থেকে ফিরে কৃষ্ণ মুসলীমদের উপর একখানা তথ্যনির্ভর বই লিখবো।

শীলাবতী বাঁকা হাসি হাসলেন আমার কথা শুনে। একটা সিগারেট ধরালেন। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন : কালো মুসলীমদের সম্পর্কে আমার কোন ধারণাই নেই; আমার কোন পেসেণ্ট ওদের সমাজের নয়। তবে এইটুকু জানি, শিকাগোই

ওদের হেডকোয়ার্টার,—এখানে একটা বিরাট মসজিদ আছে ; একদিন দেখে আসতে পারেন।

ডঃ শীলাবতী এর বেশী কিছু বলতে পারলেন না।

কিন্তু আমার পক্ষে থেমে যাওয়া সম্ভব নয়। মনের উদগ্র বাসনায় ছুটে চললাম শিকাগো শহরের আর এক প্রান্তে,—কৃষ্ণ মুসলীমদের সর্ববৃহৎ মসজিদটিকে দেখতে!

গথিক কারুকার্য-মণ্ডিত বিরাট উপাসনা গৃহ! জমকালো শ্বেত-পাথর সেট করা হয়েছে এর গাত্রে। এলিজা মহম্মদের এটা দু' নম্বর মসজিদ। স্থাপিত হয়েছিল সেই ১৯৩৪ সালে।

দেখলাম, প্রায় শ' খানেক নিগ্রো মুসলমান আলখেল্লা পরে মসজিদের চত্বরে জটলা পাকাচ্ছে। ওদের অনুচ্চ কণ্ঠস্বরকে অনুসরণ করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না।

নিগ্রো মুসলমানদের ধর্মীয় ও সামাজিক আন্দোলন আজ যুক্তরাষ্ট্রের বুকে কম্পন তুলেছে। অথচ, মাত্র চার দশক আগেও ক'জন নিগ্রোই বা জানতো কৃষ্ণ মুসলীমদের কথা। সত্যি কথা বলতে কি ১৯৫১ সালে প্রথম মার্কিন সরকার সচেতন হয়ে উঠলেন, মুসলীম আন্দোলনের গতি প্রকৃতি সম্পর্কে।

এলিজা মহম্মদকে নিয়ে আজ আলোচনা-সমালোচনার অন্ত নেই। তাঁর নাম এবং তাঁর শিষ্যদের কার্যকলাপ বাতাসের বেগে ছড়িয়ে পড়ছে বিশাল যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিটি আনাচে-কানাচে।

বিজ্ঞান নির্ভর যুক্তরাষ্ট্রে কোন মানুষকে খ্যাতির শিখরে তুলে দিতে খুব বেশী সময়ের দরকার হয় না। সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিসনের পাবলিসিটি পেলে যে কোন মানুষ এখানে রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে উঠতে পারেন।

এলিজা মহম্মদও পাবলিসিটি পেয়েছেন। ব্যাপক প্রচার হয়েছে তাঁর নামে। সংবাদপত্রের শিরোনামায় তাঁর নাম,—সাংবাদিকের

ব্যবসায়িক মন তাঁকে নিয়ে রহস্যকুণ্ডলি পাকাবার চেষ্টা করেছে। রেডিওতে এলিজা মহম্মদের নাম ধ্বনিত,—গণমানসে তরঙ্গ তুলেছে কৃষ্ণমুসলীম-নেতার কার্যকলাপ। সর্বোপরি টেলিভিসনের পর্দায় পর্দায় দেখা গেছে এলিজাকে,—ওঁর ঋজু বাচনভঙ্গি এবং দৃষ্টির গভীরতায় নিগ্রোরা সচকিত হয়ে উঠেছে।

এলিজা মহম্মদ বলছেন :

'…আমি আমার জীবনের পবিত্র উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রথম সচেতন হই ১৯৩০ সালে। ঐ বৎসর পয়গম্বর ওয়ালেচ্ ফ্রাড মহম্মদ কালো মুসলমান সমাজের দায়িত্ব গ্রহণে আমাকে আহ্বান জানান।

ফ্রাডের পায়ের কাছে বসে আমি গ্রহণ করি ধর্ম ও ইতিহাসের বিস্তৃত পাঠ: বুঝতে পারি, কালো জাতিদের মুক্তি কোন পথে আসবে। আমাকে রক্তচক্ষু নিয়ে তাকাতে হলো ককেশিয়ান [Caucasian] জাতির দিকে, যারা নিজেদের নর্কিড রক্তের গৌরবে এতকাল নির্বিচারে কালোদের হত্যা করে এসেছে। বুঝলাম, খৃষ্টধর্মকে হাতিয়ার বানিয়েই এরা তাদের শোষণতন্ত্রকে কায়েম করেছে। কিন্তু সত্য কোনদিন চাপা থাকে না। বহু শতাব্দী ব্যাপি এই অত্যাচার ও অহঙ্কারের জবাব দিতে কালোরা আজ পবিত্র ইসলামের নামে শপথ নিয়েছে। আমাদের ধমনীতে প্রবাহিত হচ্ছে উত্তপ্ত রক্ত স্রোত,—শ্বেতাঙ্গদের সমস্ত দর্প চূর্ণ করতেই আমার আবির্ভাব।…

আল্লার কাছ থেকে আমি আগামী ইতিহাসের রূপরেখা জানতে পেরেছি! আমি জেনেছি, ১৯৭০ সাল থেকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চূড়ান্ত পতন শুরু হবে। ধ্বসে পড়বে এর ধনতান্ত্রিক অহমিকা, মানবিকতার প্রতি উপেক্ষা এবং কৃষ্ণাঙ্গদের উপর একটানা অত্যাচার!

সমগ্র পৃথিবীতে কম্পন উঠবে ঐ বৎসরই। বিশ্বের তাবৎ

কালো, বাদামী, পীত এবং লাল মানুষরা আল্লা নির্দেশিত পথে সাদাদের মুছে ফেলবে চলমান যুগ-পৃষ্ঠা থেকে।...'

এলিজা মহম্মদের এমন প্রকাশ্য লোমহর্ষ ভাষণ শুনলে কার মাথা ঠিক থাকে? অত্যাচারিত নিগ্রোরা দলে দলে ছুটে আসে তাঁর কাছে। সামরিক অনুশাসনে ওদের সংঘবদ্ধ করেন এলিজা। বিরাট বিরাট জমকালো মসজিদে কালো মুসলমানদের আলোচনা সভা বসে। ওদের নিবিড় শলাপরামর্শে আমেরিকার ভয়াবহ সম্ভাবনার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। প্রচণ্ড দাহিকা-শক্তিতে সবকিছুকে ধ্বংস করে দিতে যেন হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন এলিজা মহম্মদ। তাঁর শিষ্য অনুরাগীর সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। ঝড় তুলেছে তারা। ঝড়ের গতিতে গাড়ি চলায়, শ্বেতাঙ্গদের দিকে প্রতিহিংসার রক্তচক্ষু মেলে তাকায়, খৃষ্টান নিগ্রোদের ঘৃণার চোখে দেখে, বিদেশীদের করে অবজ্ঞা, আর হাত তুলে সমবেত চিৎকারে জানিয়ে দেয়:

আমরা মানি না! আমরা মানি না তোমাদের রাষ্ট্র, এ সমাজ, শান্তির নামে এত সব বুজরুকি! মানি না শ্বেতাঙ্গদের, স্বীকার করি না নিগ্রোদেরও। আমরা মূর,—রক্তে মোদের জেহাদী উন্মাদ!....

ঐতিহাসিক প্রবাহকে যাচাই করতে গিয়ে দুটো ধারা আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এদের একটা হলো উৎকট স্বাতন্ত্র্যবাদ, অপরটা হলো সার্বভৌম সাম্যবাদ। য়ুরোপ ও আমেরিকান সভ্যতা এতকাল এই উৎকট স্বাতন্ত্র্যবাদেরই জয়ধ্বনি দিয়ে এসেছে,— ধনতান্ত্রিক পরিমণ্ডলে ব্যক্তিস্বাধীনতার নামে তারা চালিয়ে এসেছে চূড়ান্ত শোষণ ও অত্যাচার। বর্ণ ও অর্থের ধ্যানে তারা থেকেছে সম্মোহিত।

এমন সম্মোহন ভাব নিজের প্রভুত্ব কায়েম রাখতে পেরেছে কম সময় নয়,—একুনে প্রায় তিন শত বৎসর।

আজ সার্বভৌম সাম্যবাদের যুগে তাই ধনতান্ত্রিক স্বাতন্ত্র্যবাদে দারুন পচন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। অর্থ, বর্ণ ও প্রতিপত্তির জঞ্জালে আগুন লেগেছে। আগুন ধরিয়েছে নিজেরাই। নিজেরাই নিজেদের আগুনে পুড়ে মরছে।

আমেরিকার জান্তব চেতনা প্রচণ্ড চোট খেয়েছে সেই শতাব্দী লাঞ্ছিত বর্ণ বিদ্বেষ থেকেই। এই racism এর হাত থেকে মুক্তি পাওয়া আর ধনতান্ত্রিক দেশ আমেরিকার পক্ষে সম্ভব নয়। 'অন্ধ ঘেটো'-র অত্যাচার নিগ্রো-মানসে যে বিষক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে, মার্কিন রাষ্ট্রনায়কদের ক্ষমতা নেই তাতে প্রলেপ দেবার।

'নিগ্রো-ঘেটো' সম্পর্কে যৎকিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা আমার আছে। সেই নোংরা বস্তি জীবন দেখে স্বভাবতই মনে হয়েছে, শ্বেতাঙ্গ প্রধান আমেরিকা এক বিরাট বিস্ফোরণের মুখে ক্রমশই এগিয়ে চলেছে। নিগ্রোদের বুভুক্ষু হৃদয় আর শান্তির ললিত বাণীতে তেমন সাড়া দিতে চায় না। মার্টিন লুথার কিং জীবিত থাকলে হয়তো সহিংস পথ এড়ানো যেত; কিন্তু যেদিন আমেরিকার মাটিতে তাঁর হৃদপিণ্ডের রক্ত ফিনকি দিয়ে ছিটকে এলো, সেদিনই অনুভব করা গিয়েছিল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ কত অগ্নিগর্ভ! এখন এখানে কয়েক হাজার এলিজা মহম্মদের আবির্ভাব ঘটলেও আশ্চর্যের কিছুই থাকবে না।

বুদ্ধিজীবি মহল যে এ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন না, তা নয়। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বৃদ্ধ অধ্যাপককে আমি দেখেছি, racism এর ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে গবেষণা করতে। ডঃ কেনিথ বি, ক্লার্ক তাঁর Dark Ghetto বইতে হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন: 'The Dark ghettos are social, political, educational and—above all—economic colonies. Their inhabitants are subject peoples, victims of the greed, insensitivity, guilt, and fear of their masters.'

নিগ্রোরা তো বুঝে নিয়েছে, ঘৃণার জবাব ঘৃণার দ্বারাই দেওয়া যায়। কিন্তু সাদারা ভাবতেও পারেনি, কালোদের প্রত্যাঘাত এমন তীব্রতা নিয়ে আসবে! গোপন অপরাধের উত্তেজনা নিয়েই ঘেটো গুলি পূর্ণিমার সমুদ্রের মতো ফুলে ফুলে উঠছে। আমি একটি স্বাস্থ্যবতী, বেশ সুন্দরী নিগ্রো মেয়েকে জানতাম,—জুলি। জুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতত্ত্ব বিভাগের ছাত্রী। কিন্তু ও যে প্রচ্ছন্ন গণিকা, তা জানা ছিল না। প্রায়ই একাধিক শ্বেতাঙ্গ যুবকের সঙ্গিনী হয়ে যেন উড়ে চলতো। ওর তন্বী, মিশকালো চুল, টানা চোখ, ঢাউস বুক আর পাহাড়ের মতো পাছা,—সহজেই রক্তে আগুন ধরিয়ে দেয়। শিকাগোর একটি ছোট ঘরে অনেক শ্বেতাঙ্গ ছাত্রকে দেহ দিয়েছে সে!

হঠাৎ একদিন জুলি বেপাত্তা হয়ে গেল,—বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করেছে! কিন্তু যাবার আগে অন্ততঃ এক ডজন শ্বেতাঙ্গ যুবকের সর্বনাশ করে গেছে সে,—সিফিলিসে ভুগতে শুরু করেছে তারা।

এও এক ধরণের প্রতিশোধ! সেই racism! বেছে বেছে শ্বেতাঙ্গ ছাত্রদেরই জুটি বানাতো জুলি!…

আমেরিকার বর্ণ-অত্যাচারের চরিত্র কি?

এখানে আসলে ধনী শ্বেতাঙ্গরা দরিদ্র কৃষ্ণাঙ্গদের শ্রমকে চিরদিন নিজেদের পুঁজি বৃদ্ধির কাজে লাগাতে চেয়েছে। ধনতান্ত্রিক দেশমাত্রই ক্রীতদাস প্রথাকে মদত দেয়; আর আমেরিকা তো তাদের নাটের গুরু!

বর্ণবিদ্বেষের অভিপ্রকাশ কিছুটা হয় প্রকাশ্যে, আবার কিছুটা চিরদিনই প্রচ্ছন্ন থাকে।

যেটা প্রকাশ্যে ঘটে, সেটাই আমাদের চোখে পড়ে এবং সেই তাৎক্ষনিক ঘটনার আলোচনায় আমরা মেতে উঠি। কিন্তু যেটা প্রচ্ছন্নভাবে চলে, তার বিষময় ক্ষমতা সম্পর্কে অনেক সময়েই আমরা অবহিত থাকি না।

মুখোমুখি সাদা-কালোর দাঙ্গা নিয়েই আমাদের যত মাতোয়ারা! কটা মরলো, কতগুলি দোকান ভষ্মিভূত হলো, পুলিশ কি করছিল, —এ সব নিয়েই যত আলোচনা-বিবেচনা, তর্কা-তর্কি···। কিন্তু ঐ সব প্রকাশ্য দাঙ্গার আড়ালে যে কত সহস্র জীবনী শক্তি নিঃশেষে শেষ হয়ে যাচ্ছে, ক'জন লোক তার খবর রাখে?

প্রথমটি ব্যক্তিগত বা মুষ্টিমেয়ের অপরাধ; কিন্তু দ্বিতীয়টির জন্য অপরাধী মার্কিন রাষ্ট্রব্যবস্থা, সমাজ ব্যবস্থা এবং অর্থনৈতিক অবস্থা!

আলবামা প্রদেশে নিগ্রোদের একটি চার্চের উপর শ্বেতাঙ্গ গুণ্ডারা দারুণ বোমবাজি চালায়। গির্জাটি ধ্বসে পড়ে এবং প্রার্থনারত পাঁচটি নিগ্রো শিশু সাথে সাথে মারা যায়। সমস্ত দেশ জুড়ে হাহাকার পড়ে গেলো সেই ঘটনায়। সেনেটে উত্তপ্ত আলোচনা চললো ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দক্ষিণের চাপা উল্লাসের সাথে উত্তরের দেখা গেল কুম্ভিরাশ্রু! দেশ-বিদেশে ঘটনাটা ফলাও করে প্রচারিত হলো, টেলিভিসনের পর্দায় ফুটে উঠলো সেই বিধ্বস্ত চার্চের ছবি এবং নিহত পাঁচটি নিগ্রো শিশুর মুখ! মনে হলো, এর চেয়ে বড় বর্ণ-বিদ্বেষী অপরাধ আলবামা প্রদেশে বুঝি আর কখনো ঘটেনি!

কিন্তু এ হিসেব ক'জনে রাখে যে, ঐ আলবামা প্রদেশেই প্রতি বৎসর পাঁচশত নিগ্রো শিশু মারা যায় শুধুমাত্র পুষ্টিকর খাবার, দুধ, আশ্রয় এবং চিকিৎসার অভাবে? এবং সহস্র সহস্র নিগ্রো যুবক অভাবের জ্বালায়, দুর্বিসহ বেকার জীবন আর সহ্য করতে না পেরে তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে? বীভৎস বস্তি-জীবনে তাদের আনন্দ নেই, সুস্থ যৌন বিকাশ নেই, ভবিষ্যতের স্বপ্ন নেই! বর্ণবিদ্বেষী পুঁজিবাদী দেশের এ চিত্র যে কত ভয়াবহ, কলমের ভাষায় তা চিত্রিত করতে পারছি না।···

সুতরাং এলিজা মহম্মদের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার জন্য নিগ্রো সমাজকে দায়ী করা চলে না। এর জন্য দায়ী পুঁজিবাদ, মার্কিনী রাষ্ট্র ব্যবস্থা এবং ভেক গণতন্ত্রের নামে নির্বিচারে বর্ণবিদ্বেষী শোষণতন্ত্র চালিয়ে যাওয়া!

এলিজা নিজের সাফল্য সম্পর্কে সুনিশ্চিত। ধর্মের ডাকে নিপীড়িত মানুষ যতটা সাড়া দেয়, অন্য কিছুতে অত নয়। তাই ইসলামের নামে যূথবদ্ধ করছেন তিনি আমেরিকার নিগ্রো সমাজকে।

এলিজা মহম্মদ বলেন, 'তথাকথিত আমেরিকান নিগ্রোরা' অতিমাত্রায় সরল; তাই তারা তাদের শত্রুকে চিনতে পারেনি। মহামানব ফ্রাডই প্রথম তাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন, কে তাদের শত্রু। শত্রু ঐ ককেশিয়ান শ্বেতাঙ্গরা এবং এই শত্রুর সমূলে বিনাশ সাধনই কৃষ্ণ মুসলীমদের পবিত্র দায়িত্ব! কৃষ্ণাঙ্গরা এতদিন দিক্‌ভ্রষ্ট হয়ে খৃষ্টানিটির বেদীমূলে মাথা ঠুকেছে, আল্লার নামে কোন শপথ তারা নেয়নি। আজ সেই সুযোগ উপস্থিত,—ইসলামের বাণী তাদের সঠিক পথ নির্দেশ করবে।

এলিজা চাইছেন, তাঁর শিষ্যরা হবে যেন একই পরিবারভুক্ত কতকগুলি সুশৃংখল মানুষ। তাদের ধর্ম এক, ভাষা এক, ভাব অভিন্ন, —নিজেদের মধ্যে কোন রকম বিরোধের তারা প্রশ্রয় দেবে না। একের বেদনায় অপরে অনুভূতি প্রবণ হয়ে উঠবে; একের বিপদে সকলে অংশ নেবে!

এলিজার এই প্রয়াসেই আমেরিকার black nationalism এক নতুন খাতে বইতে শুরু করেছে।

নিগ্রো সমাজের এক বিরাট অংশকে এলিজা মহম্মদ স্বতন্ত্র করে এনেছেন। তীব্র স্বাতন্ত্র্যবাদের ভাবধারায় তারা লালিত। প্রকৃত ইসলাম ধর্মে যে মহত্ব ও উদারতার সন্ধান পাওয়া

যায়, এলিজা মহম্মদের কার্যধারায় তার বিন্দুমাত্রও প্রমাণ নেই।

এলিজা তাঁর বাণী প্রচারের উপযুক্ত ক্ষেত্র বেছে নিয়েছেন ঘেটো-বাসী দরিদ্র নিগ্রোদের মধ্যে। এরা অধিকাংশই দক্ষিণাঞ্চলের নির্যাতিত ও বিতাড়িত ভূমি দাসের দল। আগে তারা বাস করতো দক্ষিণ আমেরিকার গ্রামগুলিতে। কিন্তু শ্বেতাঙ্গ ধনীদের ক্রমাগত পেষণে ক্রমশ সরে আসতে বাধ্য হয়েছে উত্তরেব সমৃদ্ধশালী নগর ও শহরে। এখানে এসে তাদের অনেকেই হয়েছে কল কারখানার তৃতীয় শ্রেণীর মজুর, বাড়ির চাকর, হোটেলের ঝাড়ুদার ইত্যাদি। নিদারুণ হতাশা, দারিদ্র্য এবং আদর্শহীনতায় ভরা তাদের জীবন। আবদ্ধ নোংরা জলাশয়ের মতো সীমিত তাদের বিস্তার। গ্রামে ফিরে যাওয়া আর তাদের পক্ষে সম্ভব নয়; আবার শহুরে জীবনের সাথে খাপ খাইয়ে চলাও তাদের পক্ষে দুঃসাধ্য। ঘড়ির পেণ্ডুলামের মতো দুলছে তারা। শ্বেতাঙ্গ সমাজের প্রতি অক্ষম হিংস্রতা আর উচ্চস্তরের নিগ্রোদের হিংসা করা,—এ ছাড়া দ্বিতীয় পথ নেই তাদের। এরাই হলো আধুনিক আমেরিকার নিগ্রোদের উভয়সংকটের (Negro's dilemma) মর্মকথা।

সেই মর্মস্থানে আসন পেতেছেন এলিজা মহম্মদ।

দক্ষিণ থেকে যত নিগ্রো উত্তরে আসে, এলিজাব সমর্থকদের সংখ্যা ততই বৃদ্ধি পায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর গহণ দক্ষিণাঞ্চল থেকে এই আগমণ ক্রমশই বেড়ে চলেছে। প্রায়ই উদ্বাস্তু নিগ্রোরা দলে দলে এসে ঢুকছে লস্ এনজেলস্, পিটস্বুর্গ, একর্ণ, গ্রে, কানসাস, ফিলাডেলফিয়া, ওয়াশিংটন, শিকাগো, ন্যূইয়র্ক এবং অন্যান্য বহু শিল্পাঞ্চলে। উত্তর আমেরিকায় নিগ্রোদেব সংখ্যা যে ভাবে বেড়ে চলেছে, নীচের পরিসংখ্যান থেকেই তা ধারণা করা যাবে:

সাল···	শতকরা	উত্তরকালে নিগ্রোদের সংখ্যা···
১৯০০···	১০%··	১,৬৪৭,৩৭৭
১৯১০···	১১%··	১,৮৯৯,৬৫৪
১৯২০···	১৫%··	২,৪০৭,৩৭১
১৯৩০···	২১%··	৩,৪৮৩,৭৪৬
১৯৪০···	২৩%··	৩,৯৮৬,৬০৬
১৯৫০···	৩২%··	৫,৯৮৯,৫৪৩
১৯৬০···	৪০%··	৯,০০৯,৪৭০*

[* Census report, U. S. A., 1960.]

মার্কিন সরকারের সাথে সমস্ত রকম সহযোগিতা বন্ধের ডাক দিয়েছেন এলিজা মহম্মদ। সাদাদের সাথে সম্পর্ক চুকিয়ে দিতে বলেছেন; বলেছেন, নিগ্রোসুলভ অসহায় বোধকেও ত্যাগ করতে।

এলিজার নির্দেশেই কালো মুসলমানরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোন নির্বাচনে অংশ নেয় না, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে তারা রাজি নয়; হাজতবাস, বেত্রাঘাত, সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত, —কোন রকম শাস্তিতেই এলিজা মহম্মদের শিষ্যরা মাথা নত করতে রাজি নয়।

হোয়াইট হাউস্ আজ তাই প্রায় দিশাহারা। কালো মুসলমানদের উত্তপ্ত লাভা স্রোতকে বাধা দেবার কোন উপায় তাঁরা খুঁজে পাচ্ছেন না। আর যে হারে নিগ্রোরা এলিজার শিষ্যত্ব গ্রহণ করছে, তাতে উচ্চ-বিত্ত নিগ্রোদেরও সমূহ বিপদ। মাত্র কয়েক বৎসরের ব্যবধানে এলিজা মহম্মদের ছায়াটা বিরাট হ'য়ে উঠেছে, মুখ ব্যাদন করে আছে ওটা,—এক সর্বগ্রাসী দর্শনে গ্রাস করে নেবে সমগ্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকেই!

॥ চার ॥

চা-চা-চা!

শেক্-শেক্-শেক্···

কিস-কিস···কিল-কিল....

নাচ চলেছে। উদ্দাম নাচ চলেছে। আমেরিকা বাই নাইট। রাতের আমেরিকা।

কুহকী আমেরিকা এখন বড় নৃত্য চটুল। ক্লারিওনেটের রিডে রিডে বিলাপ। পিয়ানোর কান্না।

আচমকা প্রচণ্ড জোরে হেসে উঠলো নিগ্রো মিউজিসিয়ানঃ ইয়া! ওর সাদা দাঁতগুলি অঙ্কুশের মতো ঝলসে উঠলো। লাল-নীল নেলপালিশ মাখানো দু'খানা হাত এগিয়ে আসছে, পিছিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ আলিঙ্গন! তারপর চুম্বনের পর চুম্বন।

রাতের শিকাগো হোটেল।

দপ্ দপ্ করে নিয়ন আলো জ্বলছে-নিভছে। বোঁ বোঁ চক্কর খায় ক'টি অক্ষরঃ ওয়েল কাম! ইউ মে হ্যাভ সুইট নাইট হিয়ার। কাম এ্যাণ্ড এনজয়!

একটা মস্ত কাঁচের জার। আর তারই মধ্যে এক উলঙ্গিনীর সে কী দাপাদাপি। শ্যাম্পেনের অবগাহন প্রত্যেকের। কষ বেয়ে ফেনা উদ্গীরণ। ঢুলু ঢুলু দৃষ্টির সামনে শ্বেত-রক্তাভ ভেনাসের দল ঘুরপাক খাচ্ছে। প্রতিটি মেয়েকেই মনে হয় গ্রেস্‌ফুল। নিতম্বের সৌন্দর্যে প্রত্যেকের বয়স যেন পঁচিশ থেকে ত্রিশের মধ্যে আটকে আছে। অবশ্য আমার হোটেল-বিশারদ বন্ধু ড্যান্নি অস্ত

কথা বলে। এদের মূল বস্তুটি নাকি বড় স্থূল, ঢলঢলে, বয়সের মা-বাপ নেই।

কত রকমের নাচ। চটকদারী নাচ। স্পেনের, দক্ষিণ আমেরিকার, গহণ আফ্রিকার···আন্তর্জাতিক নাচের বাজার। চার্লস্‌টন, চা-চা, শেক, ট্যাংগো, স্প্যানিশ ওয়ালজ্‌, রাম্‌বা, সাম্‌বা, গো গো, ফকস্‌ ট্রট্‌....ইত্যাদি ইত্যাদি।

নাচ যেখানে, নিগ্রোরাও সেখানে। নাচে যেন এদের জন্মগত অধিকার। এদের মতো তালজ্ঞান, নাচের ভঙ্গীমায় বৈচিত্র্য আনবার ক্ষমতা অন্য কোন জাতের নেই।···

জীবনে এই দ্বিতীয়বার রাতের আমেরিকাকে প্রত্যক্ষ করতে এলাম। সহপাঠী ড্যান্নির জুটি হয়ে এলাম। ড্যান্নিকে বলে নিয়েছিলাম, ভাই আমি কিন্তু নাচ জানি না। আর শ্যাম্পেনে আমার আসক্তি নেই।

ড্যান্নি হেসে উঠেছিল, ভয় নেই ; তুমি শুধু দর্শক হয়ে থাকবে। অল্প স্বল্প বিয়ার চেখে বেরিয়ে আসবে। লেখক মানুষ,—এমন অভিজ্ঞতা কাজে লাগতে পারে।

বুঁদ হয়ে বসে এদের কাণ্ডকারখানা দেখছি।

হঠাৎ হাতঘড়ির দিকে নজর পড়তেই চমকে উঠলাম ঃ ইস্‌, রাত বারোটা !

এবার উঠতে হয়। ড্যান্নিকে দেখলাম, পাগলের মতো শেক্‌ নাচছে। হাতের ইশারায় ওকে আসতে বললাম। কিন্তু ড্যান্নি আসতে রাজি নয়। হয়তো রাত কাবার করে দেবে। কোটিপতি তেল-ব্যবসায়ীর ছেলে। জীবন-দর্শনই ওর আলাদা।

অগত্যা আমি একাই ফিরে আসতে থাকি। কার্পেট মোড়া সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামতে থাকি। নেমে এলাম একেবারে হিমশীতল রাস্তায়। প্রাণচঞ্চল শিকাগো এখন পাথুরে স্তব্ধতায় সুপ্ত। এক ঝলক হিমেল বাতাস ঝাপটা মারে। একটা

চুরুট ধরাই। বাদামী উষ্ণ ধোঁয়া বুকের মধ্যে চেপে রাখতে চাই।

হন্ হন্ করে নিজের ফ্ল্যাটের দিকে এগিয়ে আসতে থাকি।

হঠাৎ কানে এলো, পিছনে কারা যেন চিৎকার করছে! ঘুরে তাকালাম। বিস্ময়ে আমার কণ্ঠরোধ হয়ে আসে। অনেক দূরে আকাশটা লাল,—নির্ঘাত আগুন লেগেছে। দুম দাম বোমা ফাটার আওয়াজ। আর্ত রব, কনভয় আর মটোর সাইকেল ছুটে যাবার ঘর্ঘর শব্দ। মুহূর্তের মধ্যে রাতের শিকাগো প্রেতপুরীর চেতনা নিয়ে জেগে উঠলো। একসঙ্গে যেন শুনতে পেলাম, হাজারটা গুলিবিদ্ধ পাখীর পাখা ঝটপটানি। 'ওয়েলকাম' হোটেলের বাতিটা দপ্ করে নিভে গেছে। ক্লারিওনেটের বিলাপ আর শ্রুত নয়। পিয়ানোর কান্না থেমে গেছে। স্ফূর্তি করতে যারা গিয়েছিল, তারা সবাই দিশাহারা। চিৎকার, ছোটাছুটি, কাঁচের জার ভেঙ্গে খান খান, উলঙ্গিনী আতঙ্কে থর থরিয়ে কাঁপছে। যমদূতাকৃতি কতকগুলি মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়েছে, ভেঙ্গে সব তচনছ করে দিলো।

চিৎকার ক্রমশ এদিকেই যেন ধেয়ে আসছে।

আমি ছুটতে শুরু করি। ছুট-ছুট-ছুট। সোজা নিজের ফ্ল্যাটে গিয়ে হাজির হই। হাত-পা সব থর থরিয়ে কাঁপছে। কেন এমন কাঁপছে। কেন এমন হলো? ড্যান্নির কি দশা ঘটলো, কে জানে? আর ভাবতে পারছি না। দুগ্ধ ফেনিল শয্যাকে আঁকড়ে ধরি। বাইরে তখনো আর্তরব, ক্র্যাকার ফাটছে, দোকান লুঠ হচ্ছে, হুঙ্কার, পুলিশের কনভয়ের গর্জন।...

ঘটনাটা জানা গেল পরদিন।

ভোরের সংবাদপত্র জানিয়ে দিলো সব। একদল শ্বেতাঙ্গ যুবক নাকি এক নিগ্রো পল্লীতে হামলা চালাতে গিয়েছিল। তারই বদলা নিতে ছুটে আসে শ' তিনেক নিগ্রো পুরুষ। প্রচণ্ড ঝটিকা

আক্রমণে রাতের শিকাগোকে রক্তাক্ত করে তোলে। পুলিশ অবশ্য অল্পতেই ঘটনার সামাল দেয়। প্রাণহানি ঘটেনি। জনা পঞ্চাশেক হাসপাতালে কাতরাচ্ছে।

ড্যান্নি কিন্তু অক্ষত শরীরেই ফিরে আসতে পেরেছে। এসেই দাপাদাপি। প্যান্টের বোতাম খুলতে খুলতে বলে, 'এ আগুন সহজে নিভবে না।...আমার মনে হয়, এর পিছনে ব্ল্যাক মুসলীমদের হাত আছে।'

ড্যান্নির কথা শুনে আমি সোজা হয়ে বসি: তোমার এমন সন্দেহের কারণ?

ড্যান্নি বললো: এর আগেও এমন ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ ওদের মসজিদে তল্লাসি চালিয়ে অনেক মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধারও করেছিল।

আমি বললাম: তোমরা নিগ্রোদের অমন হেয় চোখে দেখো কেন?

ড্যান্নির চোখ দুটো ধক করে জ্বলে ওঠে: মোটেই না, আমরা ওদের স্বীকৃতি দিতে রাজি আছি। কিন্তু ওরা পারছে না আমাদের পর্যায়ে উঠে আসতে।

আর কথা না বাড়িয়ে চুপ করে যাই। অধিকাংশ মারমুখী শ্বেতাঙ্গের মুখেই এমন জবাব শুনতে পেয়েছি। নিগ্রোরা নাকি তাদের পর্যায়ে উঠে আসতে পারছে না, তাই এমন ঘৃণা ও অত্যাচার চলছে এবং চলবে। কিন্তু কেন? নিগ্রোরা তাদের সংস্কার ও শিক্ষার ধারাকে পরিবর্তন করে পরকীয়া হয়ে উঠবে কেন? আর পুরোপুরি শ্বেতাঙ্গদের সামিল হলেও কি তারা সমমর্যাদা পাবে? নিশ্চয় নয়। একটা সূক্ষ্ম ঘৃণা ও অবজ্ঞা এই উচ্চতর মহলেও ওদের মনে প্রতিনিয়ত বেদনার সঞ্চার করবে।

নিগ্রোরা সকলেই মারমুখী নয়। আমেরিকার সুখ-দুঃখের সাথে নিজেদের মিলিয়ে দেবার অনেক চেষ্টাও তারা করেছে। মার্টিন

লুথার কিংয়ের অনেক আগে থেকেই একাধিক নরমপন্থী নিগ্রো এর জন্য সংগ্রাম চালিয়ে এসেছেন। যেমন বুকার টি ওয়াশিংটন, ডঃ ডুবয়ে ইত্যাদি। আর নিগ্রো নারী সমাজের প্রগতিতে আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন মিসেস্ বেথুন।

১৮৯৬ সাল। মেরি বেথুন তাঁর কয়েকজন সহকর্মীর আপ্রাণ সহায়তায় স্থাপন করলেন 'ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অফ কলার্ড উইমেন'। নিগ্রো রমণীদের সর্বাঙ্গীণ বিকাশই ছিল এর উদ্দেশ্য। আরো অনেক শপথ সেদিন নেয়া হয়েছিলঃ বিশ্ব-শান্তি প্রতিষ্ঠা, বর্ণবৈষম্য দূরীকরণ, জাতিতে জাতিতে সম্প্রীতি স্থাপন, ভেদবুদ্ধি নিবারণ ইত্যাদি।

এমন অনেক ছোট বড় নিগ্রো সংগঠন আমেরিকায় দেখা যায়।

কিন্তু এদের সকলকেই আচ্ছন্ন করে যেন ক্রমশ বিকট বিরাট হয়ে উঠছে এলিজা মহম্মদের সংগঠন,—কালো মুসলমানদের দল।

নিগ্রোদের যারা ঘৃণা করে, এলিজা তাদের মুখের উপর উপযুক্ত জবাব দিয়েছেন। কালো মাত্রই যে দাস নয়, তিনি তা প্রমাণিত করছেন।

হাত মুষ্টিবদ্ধ, দৃঢ় ঠোঁট চেপে ধরে পায়চারি করছেন এলিজা মহম্মদ। তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপে মনে হয়, সত্যই বুঝি তিনি ইতিহাসের চাবুক! বিধাতার কশা। হূন নেতা এটিলা, রক্তথাবা তেমুচিন, উল্কাসম নাদির শাহ···এরা বুঝি সবাই তাঁর মনে ছায়াপাত করেছে। মধ্যযুগীয় ধর্ম উন্মাদনা তাঁর হাতিয়ার। আবার আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত বিলাসে তাঁর অনীহা নেই। !!।

মসজিদ গড়ে উঠছে একটির পর একটি। ওগুলি যেন দুর্গ। অনড় সংগঠন। বাজ পাখি ঝাপটা মারে। রাতের বাতাস কঁকিয়ে ওঠে। এলিজা মহম্মদের চোখে ঘুম নেই। তিনি পায়চারি করছেন। মরক্কো চামড়ার জুতোয় শব্দ উঠছে মচ-মচ-মচ। বহুমূল্য রত্ন-খচিত আলখেল্লা চাপানো তাঁর শরীরে। দামাস্কাস তলোয়ারের

মতো বলিষ্ঠ দেহ। বয়স তো কম হয় নি,—কিন্তু বার্ধক্যের বিন্দুমাত্রও ছায়াপাত ঘটেনি।

'নিগ্রোদের আহত অভিমানকে জাগিয়ে তুলতে হবে।'

এলিজা ভাবছেন। তাই ধর্মের আফিং খাওয়ানো দরকার। মরচে ধরা প্রাণশক্তি ওদের আবার জেগে উঠবে। দক্ষ বাজিকরের মতো ওদের নাচাবেন এলিজা। দম দেওয়া পুতুলের মতো ওরা কাজ করবে। শত থেকে সহস্র, সহস্র থেকে লক্ষ,—এলিজা মহম্মদের অনুগামীদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। নতুন কালের হাতছানি দেখতে পাচ্ছে তারা। যেন পেয়েছে মহাকালের অমোঘ নির্দেশ। ভেঙ্গে ফেল, গুঁড়িয়ে দাও শ্বেতাঙ্গদের নর্কিডী রক্তের সমস্ত অহমিকাকে!...

বিচিত্র আমেরিকা!

একদিকে এ দেশ চাঁদে মানুষ পাঠিয়েছে; অন্য দিকে, এ দেশের মাটিতেই এলিজা মহম্মদ ইসলামের ডাকে কৃষ্ণ মুসলীমদের নিয়ে রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা চূর্ণ করতে উদ্যত। এখানে পার্থিব সুখের অন্ত নেই। আবার অন্তর্জ্বালায় আত্মহননের সীমা নেই। সভ্যতার পীঠস্থান বলে এর গর্ব। অথচ, এমন খুন-খাবাপি, চরিত্র-হননের দেশ বুঝি দ্বিতীয়টি হয় না। এরা বংশ গৌরবে অনেকেই ডগমগ; যদিও প্রতি বৎসর পঞ্চাশ লক্ষ জারজ সন্তানের জন্ম হয় সেখানে। মুখে তাদের শান্তির ললিত বাণী; কিন্তু ভিয়েতনামে রক্তের হোলি-উৎসবে মেতেছে আজ দেড় যুগের উপর।

এলিজা রুখে দাঁড়িয়েছেন। মার্কিন সরকারের রণ-নীতির সামিল হতে তিনি বা তাঁর দল রাজি নন। ভিয়েতনামে যুব-শক্তির অপচয়কে তিনি তীব্র নিন্দা করেন। কোন ব্ল্যাক মুসলীম তাই সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিতে রাজি নয়। শত শাস্তির ভয়েও নয়। হেভী ওয়েটে বিশ্ববিজয়ী মুষ্টিযোদ্ধা মহম্মদ ক্লে (পূর্বতন ক্লেসিয়াস

ক্লে) এলিজার নির্দেশেই সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে গররাজি হন। ফলে তাঁর খেতাব কেড়ে নেওয়া হয়, রিং থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে তাঁকে। তবু এলিজার কথাকে অমান্য করতে পারেননি সদ্য ইসলামে দীক্ষিত মহম্মদ ক্লে।

এলিজা মহম্মদের উপদেশ: কাজ করুন। কঠিন পরিশ্রম করুন। সর্বদা তৎপর রাখুন নিজের স্নায়ুকে। বুক ভরা থাকবে অঢেল সাহস, বাহুতে থাকবে অমিত বল। অমেয় এই প্রাণ প্রাচুর্য নিয়ে আপনারা তাই এগিয়ে চলুন। টগবগিয়ে এগিয়ে চলুন শক্তিধর অশ্বের মতো।

মানসিক বলই প্রধান, দৈহিক সক্ষমতা সেখানে গৌণ। আর এই মানসিক শক্তি সঞ্চয় সম্ভব কতকগুলো অনুশাসনে। শিষ্যদের তাই কতকগুলি কঠোর বিধিনিষেধ মেনে চলতে বলছেন এলিজা:

১। যৌন-স্বেচ্ছাচারিতা ত্যাগ করুন। যৌন আবেগকে প্রাধান্য দিয়ে শক্তিক্ষয় করবেন না।

২। এ্যালকহলের প্রতি আসক্তি ত্যাগ করুন।

৩। অতিরিক্ত ধূমপান করবেন না।

৪। ঘুমের ওষুধ খাবেন না।

৫। জুয়ারীদের আড্ডায় যাবেন না।

৬। নাচ-গানের প্রতি বেশী মোহ না থাকাই উচিত।

৭। যতটা ঘুম স্বাস্থ্যের পক্ষে প্রয়োজন, ততটাই ঘুমোবেন। বেশী ঘুমে স্নায়ু অলস হয়ে পড়ে।

৮। স্ত্রী জাতিকে সম্মান দিন।

৯। পারিবারিক বিবাদ এড়িয়ে চলুন। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়াঝাটি নৈতিক অধঃপতনের অন্যতম কারণ।

১০। নিজেকে সর্বদা ফিটফাট, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন। ঘর দোর সর্বদা থাকবে ঝকঝকে তকতকে।

১১। দক্ষিণের নিগ্রোরা যা খেতে ভালবাসে, সেই শূকরের মাংস কখনো খাবেন না।

১২। আপনারা কখনো মাথার চুল সোজা করে রাখবেন না।

১৩। স্ত্রীলোকেরা চুলে রঙ ব্যবহার করবেন না ; ত্বকের সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য কোন প্রসাধনী বস্তুর প্রলেপ দেবার প্রয়োজনীয়তা নেই।

১৪। বেসামাল হয়ে চিৎকার করবেন না, গান গাইবেন না, অতিরিক্ত উচ্ছ্বাসে অট্টহাসি হাসবেন না।

এই প্রতিটি নির্দেশই কৃষ্ণ মুসলীমদের মেনে চলতে হয়। এতটুকু স্খলন ক্ষমা করা হয় না। প্রয়োজন হলে অবাধ্য সদস্যকে সমাজ থেকে সাত থেকে ত্রিশ দিনের জন্য বরখাস্ত করা হয়। তাতেও চরিত্র সংশোধন না হলে, এলিজা তাকে শিষ্য রূপে গ্রহণ করতে রাজি নন।

শ্বেতাঙ্গদের হাত থেকে পরিপূর্ণ মুক্তি চাই। সামাজিক, ধর্মীয়, অর্থ নৈতিক, রাজনৈতিক ও শিক্ষাগত স্বাতন্ত্র্য লাভ করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ এলিজা মহম্মদের অনুগামীরা। শুধুমাত্র কৃষ্ণ মুসলীম পরিবারের শিক্ষার জন্য শিকাগো ও ডেট্রয়ট শহরে বেশ কয়েকটি স্কুলও খোলা হয়েছে।

কালোদের মনে আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনবার জন্য এলিজা প্রায়ই ইতিহাস টেনে উপমা দেন। বলেন, আল্লা চিরদিনই এই কালো লোকদের কল্যাণ চান। তামাম্ দুনিয়ায় কালোদের ভূমিকা কারো চেয়ে হেয় নয়। হাবসীদের লৌহ কঠিন বাহুবলে এশিয়া ও আফ্রিকা একদিন জেগে উঠেছিল। আরবীয়-মিশরীয় মূল সভ্যতায় তাদের অবদানই (?) সর্বাধিক।

নিশ্চিত প্রত্যয়ে এলিজা মহম্মদ দেখছেন, এক অভিন্ন উদ্দেশ্যে কৃষ্ণ মুসলীমের দল জেগে উঠছে। গুহা থেকে বেরিয়ে আসা

সিংহের মতো গাম্ভীর্য তাদের। ভয়, হতাশা, দুশ্চিন্তা, নির্বিকার ভাব,—সব কিছুকে দলিত করে এগিয়ে চলেছে 'ইসলামের নব্য জগৎ' (New world of Islam) প্রতিষ্ঠা করতে!···

আর সেই ভয়াবহ ট্রাজিডির মুখোমুখি মার্কিন সমাজ এখনো সচেতন নয়। এখনো সাদারা ভাবে, কালোরা তাদের চিরন্তন দাস।

সিফিলিস রুগীর কোচকানো হাতের মতো দুমড়ে মুচড়ে আসছে তাদের ভবিষ্যৎ। তবু মানবিক সহৃদয়তায় পাপ স্খালন করতে তারা রাজি নয়। কৃষ্ণ মুসলীমদের ড্রাম, নাকাড়া তাই সমানে বেজে চলেছে 'ডিম··ডিম···ডিম··' রক্তের ফোয়ারা ছুটছে আমেরিকার প্রাণকেন্দ্রে। বিরাট পাদ-প্রদীপের সামনে দাঁড়িয়ে বিধান দিচ্ছেন এলিজা মহম্মদ: ভেঙ্গে ফেলো। চূর্ণ করো শ্বেতাঙ্গদের অন্তিম অহমিকাকে! আমরা এক নতুন রাষ্ট্র, নতুন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলবো!···

চকিতে ঘুরে তাকালাম ড্যান্নির দিকে। সভয়ে দেখলাম, প্যান্টের এক গোপন স্থান থেকে একটি চকচকে স্বয়ংক্রিয় পিস্তল টেনে বার করলো সে। বাইরের আকাশের দিকে চোখ মেলে দাঁতে দাঁত ঘর্ষণ করে ওঠে: নিগার ব্যাস্টার্ডগুলিকে উচিত শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন!···আমি চললুম!

চিত্রার্পিতের মতো দেখছি, ড্যান্নি সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে নেমে যাচ্ছে। সমগ্র আমেরিকাই নেমে যাচ্ছে। নেমে যাচ্ছে কোন পাতাল-গহ্বরে!···

॥ পাঁচ ॥

মিকি ওরফে মাইকেল ভ্যালেনটাইন ওরফে নরুল ভ্যালেনটাইনের সাথে শেষ দেখা ২০শে এপ্রিল, ১৯৫৮। আমার প্রবাসী ছাত্র জীবনেরও তখন প্রায় ইতি হয়ে এসেছে। পরীক্ষা দিয়েছি। ডিগ্রী পেয়েছি। শিক্ষার মান এখানে অনেক উন্নততর। কিন্তু শিক্ষাপদ্ধতি এমন চমৎকার যে পরীক্ষা দেবার পূর্ব মুহূর্তেও মাথাটাকে খুব ভারী মনে হয় না।

দেখতে দেখতে শিখছি। শিখতে শিখতে লিখছি। খোলা মেলা মনে লেখার নেশাটা জাঁকিয়ে বসেছে। পরীক্ষা শেষে ভাবলাম, আর একবার,—হয়তো শেষবারের মতো,—শান্ত শহর রিভারসাইডে যাবো। এপ্রিলের মিষ্টি মধুর দিনগুলিতে রিভারসাইড না জানি কত অপরূপা!

যেমন ভাবনা, তেমনি কাজ।

রিভারসাইড আমায় হাতছানি দিলো,—আমি ছুটে চললাম।

এবার আমি একা। একক মুসাফির। যাযাবরী আমেজটুকু তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছি।

যাবার আগে একবার উঁকি মেরে গেলাম মার্কিন ফেডারেল কোর্টে। শিকাগো ষড়যন্ত্র মামলার শুনানী চলেছে সেখানে। লোকে লোকারণ্য। প্রধান বিচারপতি জুলিয়াস হফম্যান ছবির মতো স্থির গম্ভীর। আর সাক্ষীর কাঠগড়ায় এক বিচিত্র বেশভূষার পৃথিবী বিখ্যাত হিপি গুরু,—জিনস্‌বার্গ।

সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে জিনসবার্গ যা করলেন, তাতে ছলাৎ ক'রে আমার বুকের রক্ত যেন মাথায় উঠে এলো। জিনস্‌বার্গ পরিস্কার হরিনাম কীর্তন শুরু করেছেন,—হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ,

কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম, হরে রাম, রাম রাম, হরে হরে।

নিশ্চল বিচারক নড়ে চড়ে উঠলেন। বিস্ময়ে বলে উঠলেন: আপনি কী বলছেন?

জিনসবার্গের মুখে মধুর হাসি: আমি সংস্কৃত ভাষায় কৃষ্ণ নাম জপ করছি।

বিচারক বললেন: ফেডারেল আদালতে সংস্কৃত ভাষা অচল।

জিনসবার্গ বললেন: আমার কাছে ওটা খুবই সচল।

ব্যাপার স্যাপার দেখে দারুণ মজা লাগে আমার। জিনসবার্গের নাম এর আগে অনেক শুনেছি। আজ চাক্ষুষ দেখলাম। মার্কিন হিপি-সমাজের এক জবরদস্ত গুরু তিনি। গাজা, ভাঙ, চরসে তুরীয়-ধ্যান করেছেন বহুদিন। হিন্দু-তীর্থ বেনারসে তাঁর হাতেখড়ি। ওখানে বসেই সংস্কৃত শ্লোক তিনি কণ্ঠস্থ করেন। নিজেকে পরিচয়ও দেন একজন হিন্দু যোগী বলে। ইতিহাস ও অর্থনীতিতে দখল বেশ,—কলম্বিয়া বিশ্ববিত্তালয়ের নামী ছাত্র ছিলেন। অবাধ যৌন স্বাধীনতার তিনি বড় সমর্থক!

রাজনীতি ও সামাজিক পাঁক চক্রে আমেরিকাতে অনেক কিছু দেখবার আছে। ভাববারও আছে। এই তো সেদিন শিকাগো শহরের বুকে প্রচণ্ড যুদ্ধ-বিরোধী বিক্ষোভ দেখতে পেলাম। ভিয়েতনামের রণাঙ্গনে আর এমন যুব-শক্তির অপচয় হতে দিতে তারা রাজি নয়। যুদ্ধের চাপে ক্ষয়িষ্ণু মার্কিন অর্থনীতিও। ডলারে দারুণ কাঁপুনি লেগেছে। মিছিলের ডাকে এ্যাম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং কেঁপে উঠছে থর থরিয়ে।

ভাবছি, দেখছি এবং এগিয়ে চলেছি।

আবার এলাম সেই স্মৃতি বিজড়িত রিভার সাইডে। রুবিস্তো

পাহাড়ের কাছে দাঁড়িয়ে থাকলাম কিছুক্ষণ। চার্লি চ্যাপলিন ভঙ্গীতে লাঠি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে একজন মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক যেন বাতাসকে কাটাকুটি করছেন। এখানকার বনেদী হোটেলের চার্জ অসম্ভব। তাই এক জাপানী হোটেলে ঢুকে ভাত-মাছ খেয়ে নিলাম। তারপর আবার শুরু হলো আমার যাত্রা।

অনেকটা যেন অবচেতন মনের টানেই এগিয়ে চললাম আইটি গ্রামের দিকে। নিগ্রোপ্রধান পল্লী। অন্ধ ঘেটো। ওখানেই মিকিদের আস্তানা। মনে সন্দেহ হয়েছিল, মিকির দেখা পাবো না। কারণ, ও ইসলামে দীক্ষিত হবার পর আর হয়তো পরিবারের সাথে কোন যোগাযোগই রাখেনি।

তবু গেলাম।

ঠিক এক বৎসরের ব্যবধানে আবার ভ্যালেনটাইন পরিবারের দরজায় হাত রাখলাম আমি। মনে হলো, বাড়ীটার দীনতা যেন আরো বেড়ে গেছে। নোনাধরা ইট দাঁত বের করে হাসছে। সামনের ফুলের বাগানটা শুকিয়ে গেছে। ঝাকড়া আপেল গাছটা আর দেখতে পেলাম না।

ঃ মিকি—মিকি !

কাঁপা গলায় ডাকতে থাকি।

কোন উত্তর নেই।

ঃ মিকি—মাইক !

আবার ডাকলাম।

এবার দরজা খুলে গেল। দরজায় দাঁড়ালো মিকি নয়, মিকির বোন কেটিও নয়, ওদের বাবা আর্থার। এক বছরের মধ্যেই জীবনের যেন শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে সে। স্পষ্ট লক্ষ্য করলাম, বৃদ্ধের হাত-পা কাঁপছে। হাঁ করে দম নিয়ে চিনবার চেষ্টা করছে আমাকে।

ঃ চিনতে পারছেন ?

আমি হাসবার চেষ্টা করি।

আর্থারের ঠোঁট দুটো আরো কুঁকড়ে আসে। আরো ঝুঁকে পড়ে। তারপরই আকর্ণ বিস্তৃত হাসি ঃ ভারতীয় বন্ধু !

আর্থারের কথায় আবেগে আমার বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে। মনে হলো, এমন আপনতর আহ্বানে আমাকে এর আগে আমেরিকায় কেউ কখনো ডাকেনি। বৃদ্ধের দু' খানা হাত চেপে ধরলাম। ফিস্ ফিস্ করে জিজ্ঞাসা করলাম, "সব খবর ভালো তো ?"

আর্থারের হাসি মিলিয়ে গেলো। ঘোলাটে দৃষ্টি হারিয়ে গেল কোন সুদূরে। বাণবিদ্ধ পাখীব মতো ছটফটিয়ে উঠলো সে। ঠোঁট দুটো কাঁপতে থাকে ঃ আমি তো নরকের কীট। অপদার্থ বাপ ! ছেলেটা মুসলীম হয়ে জেল খাটছে আর মেয়েটা নোংরা রোগের চিকিৎসায় হাসপাতালে পরে আছে।

একসাথে সমস্ত আলো যেন দপ্ করে নিভে গেল আমার চোখের সামনে।

ঃ মিকি জেল খাটছে কেন ?

ঃ ওটা বেজন্মা ! দেশকে ভালবাসে না, পরিবারকে ভালবাসে না, ধর্ম ত্যাগ করে। সরকার ওকে ভিয়েতনামে পাঠাতে চেয়েছিল। রাজি হয়নি, তাই জেলে পচে মরছে।

একটানা বলে আর্থার হাঁপাতে থাকে। হাপরের মতো ওঠানামা করছে তার হারসর্বস্ব বুকখানা। নিঘুম যন্ত্রণাকাতর ক্ষতবিক্ষত চোখদুটি প্রায় অনুভূতি শূন্য।

আমি বিদায় নিয়ে পথে নেমে এলাম।

আর্থারও বলেছিল, স্থানীয় কয়েদখানায় আটক আছে মিকি। অ্যারিস্টোক্র্যাটিক শহরতলীর একপাশে সেই জেলখানা। সুড়কি

ঢালা পথ। সারি সারি পাম আর রেইনট্রি দাঁড়িয়ে আছে। জেলখানাকে জেলখানা বলে মনেই হয় না। মনে হয় একটা বিরাট বাগানবাড়ী। মুষ্টিমেয় কয়েকজন রাইফেলধারী গার্ড দাঁড়িয়ে আছে।

আমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন। তাই ঠিক ভিজিটিং আওয়ারে গিয়ে উপস্থিত হলাম। ভিজিটিং আওয়ার দিনে ছু'বার; একবার সকাল আটটা থেকে ন'টা, আর একবার বিকেল পাঁচটা থেকে সাড়ে ছ'টা পর্যন্ত। ঘড়িতে পাঁচটা বেজে দশ। মিকির দেখা মিলতে পারে!

জালিকাটা লোহার নেটের সামনে দাঁড়য়ে প্রহরীর হাতে চিরকুট পাঠিয়ে দেই: নরুল ভ্যালেনটাইনের সাক্ষাৎপ্রার্থী এস. সেনগুপ্ত।

মিকি ওরফে মাইকেল ভ্যালেনটাইন ওরফে নরুল ভ্যালেনটাইনের সাথে সেই আমার শেষ দেখা। ২০শে এপ্রিল, ১৯৬৮। মিনিট দশেক অপেক্ষা করবার পর মিকি এলো। অচঞ্চল পদক্ষেপে এসে দাঁড়ালো জালিকাটা জানালাটার ওপাশে। এক মুখ দাড়ি। কঠিন মুখাবয়ব। এতটুকু হাসি নেই। পুরু ঠোঁট ছুটিতে ঘৃণা ও উপেক্ষা। আমার মনে হলো, এক দুঃস্বপ্নের নায়ক মিকি এসে দাঁড়িয়েছে আমার সামনে।

বললাম: আমি দেশে ফিরে যাবো কয়েকদিনের মধ্যেই।

মিকি জবাব দিলো না। নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।

আবার বললাম: এরা তোমায় কবে ছেড়ে দেবে?

মাইকেলের চোখ ছুটো এবার ধ্বক করে জ্বলে উঠলো: এরা ছেড়ে দেবার কে? যেদিন মহম্মদের কৃপা হবে, কয়েদ ভেঙ্গে বেরিয়ে আসবো।

ছুটো সাঁড়াশি-সবল হাত বাইরের আকাশকে যেন টেনে

নামিয়ে আনতে চায়। একটু দূরে কোন এক বন্দী যেন বুক চিরে তীক্ষ্ণ আর্তনাদ করে উঠলো। এখানে সব নিগ্রো আসামী। মোটা গরাদ দেওয়া জানালাগুলো চেপে ধরে প্রিয়জনের মুখ দেখছে, দেখছে আকাশ, ফুল, পামগাছের শীতল হাতছানি। প্রত্যেকের দৃষ্টিতে নিদারুণ আকুলতা, অসহায়তা। কেউ কেউ বুক চাপড়াচ্ছে, —ভয়ে মাথার চুল খাড়া হয়ে ওঠে।

শুধু মিকি ব্যতিক্রম। কোন রকম মানসিক অথবা স্নায়বিক পীড়ায় সে পীড়িত নয়। বুক ভরা আগুন, সেই আগুনের তপ্ততায় উচ্চারণ করলেঃ এরা ছেড়ে দেবার কে? যেদিন মহম্মদের কৃপা হবে, কয়েদ ভেঙ্গে বেরিয়ে আসবো!…

মহম্মদ! এলিজা মহম্মদ!

চাক্ষুষ তাঁর দেখা আমি পাইনি। কিন্তু অনুভব করতে পারি, আমেরিকাতে আগুন জ্বালাবার তাঁর কী বিরাট প্রস্তুতি চলেছে। শ্বেতাঙ্গ-শাসনের যেখানেই দুর্বলতা, সেখানেই তাঁর ঘটছে প্রচণ্ড আক্রমণ!

রিক্ততায় ও তিক্ততায় নিগ্রো সমাজের অন্তর্জ্বালা সীমাহীন। ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়াতে মার্কিন সরকারের ঝোঁক ছিল, নিগ্রোদের আস্তে আস্তে আবার আফ্রিকার দিকে ঠেলে পাঠানো। আমেরিকান কলোনী স্থাপনের নামে হাজার হাজার নিগ্রোকে চালান দেওয়া হয়েছিল পূর্ব ও পশ্চিম আফ্রিকায়। আর ফিরে আসেনি তারা। ওদের এই পরিণতিতে নিগ্রোদের মনে দারুন আতঙ্কের ভাব দেখা দেয়। তারা বেঁকে বসে,— একমাত্র কানাডা ছাড়া আর কোন বৈদেশিক রাষ্ট্রে তারা পাড়ি জমাতে রাজি নয়। সম্ভব হলে ওয়েস্ট ইণ্ডিস, মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকাতেও তারা উপনিবেশ গড়তে গররাজি নয়। কিন্তু গহন আফ্রিকায় তারা হারিয়ে যাবে না কখনোই।

'…Our object and determination are to consider

our claims to the West Indies, Central and South America, and the Canadas···'

[Negro-Convention, 1835].

আফ্রিকা সম্পর্কে আজকের আমেরিকাবাসী নিগ্রোদের কোন মোহ নেই, টান নেই। এমন কি তারা 'আফ্রিকা' নামটাও পারতপক্ষে উচ্চারণ করে না। এক ধরণের হীনমন্যতায় তারা ভুলে যেতে চায় তাদের আদি বাসভূমিকে। শ্বেতাঙ্গরা আফ্রিকাকে নিয়ে যেরকম ক্যারিকেচার করে এসেছে, নিগ্রো মাত্রই তাতে লজ্জা অনুভব করে। উত্থিত আফ্রিকার গৌরবে আর তারা নিজেদের গৌরবান্বিত ভাবে না।

নিগ্রোদের বেদনাকে নিয়ে অনেক সংঘবদ্ধ আন্দোলনের ঢেউ আমেরিকার উপর দিয়ে বয়ে গেছে। সেই সব আন্দোলন যতটা না রাজনৈতিক তার চেয়ে বেশী ধর্মীয়। নিম্নবিত্ত নিগ্রোদের কোন ইজমের ফুলঝুরি দিয়ে ঐক্যবদ্ধ করা সহজসাধ্য নয়; কিন্তু ধর্মের নামে ওরা সহজেই সাড়া দেয়।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্বে ফাদার ডিভাইন (Father Divine) প্রথম এমন ধর্মীয় আন্দোলনের ঝড় আনলেন। নাম দিলেন তাকে শান্তি আন্দোলন (Peace Movement)। ফাদার ডিভাইন বলতেন, তিনি ঈশ্বরের পুত্র; তাঁর ভিতর দিয়েই ঈশ্বরের সমস্ত বাসনা মূর্ত হয়ে উঠবে।

নিগ্রো এবং শ্বেতাঙ্গ,—উভয় সমাজের কাছেই নিজের বাণী প্রচার করতে থাকেন ফাদার ডিভাইন। শ্বেতাঙ্গ সমাজের প্রতি কখনো তাঁর কোন ঘৃণা প্রকাশ পায়নি। তিনি চেয়েছিলেন, ঈশ্বরের নামে বর্ণদ্বেষবিহীন এক বিরাট মার্কিন সমাজ গড়ে তুলতে। তাঁর অনুগামীর সংখ্যাও কম ছিল না। কিন্তু 'শান্তি আন্দোলন' সফল হয়নি। মার্কিন সমাজের লাসকাটা ঘরে ফাদার ডিভাইনের সমস্ত সদিচ্ছার অপমৃত্যু ঘটেছে।

১৯১১।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সবে মাত্র শেষ হয়েছে। আমেরিকার নিগ্রো সমাজে ধূমকেতুর মতো আবির্ভূত হলেন দু'জন নিগ্রো পুরুষ,—ড্রিউ আলী এবং মারকাস্ গ্রেভে। কালো জাতীয়তাবাদে ধর্মের ছুরিতে শান দিলেন তাঁরা। আগ্নেয়গিরির উত্তপ্ত লাভার মতো উত্তেজনা ছড়াতে লাগলেন। অত্যাচারিত অপমানিত নিগ্রোরা সচকিত হয়ে ওঠে, রক্তে তাদেব হাজাব স্ফুলিঙ্গের দাপাদাপি শুরু হয়ে যায়।

ড্রিউ আলী।

কৃষ্ণ মুসলীমদের আদি নেতা। ইসলামের নতুন প্রফেট্। কৃষ্ণজাতির ভবিষ্যদ্বক্তা।

ইসলামে দীক্ষিত হবার আগে তাঁর নাম ছিল টিমথী ড্রিউ। জন্ম ১৮৮৬ সালে উত্তর কারোলিনা শহরে।

হঠাৎ ইসলাম ধর্মের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হন এবং খুব অল্প সময়ের মধ্যেই বিখ্যাত হয়ে ওঠেন। নিউ জার্সিতে তিনি প্রথম মূরীশ আমেরিকান সাইন্স টেম্পল (Moorish-American Science Temple) প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯২৫ এ শিকাগো শহরে তাঁর পদার্পণ। ইতিমধ্যেই কৃষ্ণ মুসলীমদের নিয়ে এক বিরাট সংগঠন গড়ে তুলেছেন। একটির পর একটি মসজিদ স্থাপন করেছেন পিটস্‌বুর্গ, পেনসিলভেনিয়া, ডেট্রয়ট, মিচিগান ইত্যাদি শহরে।

ড্রিউ আলী স্কুল কলেজের কোন শিক্ষা পাননি। কিন্তু নিজের মত ও তত্ত্ব আকর্ষণীয় ভাবে ব্যাখ্যা করতে পারতেন। তাঁর প্রত্যয় জন্মেছিল, ইসলাম ছাড়া আমেরিকাবাসী নিগ্রোদের মুক্তি নেই।

প্রবাদ আছে, যৌবনে ড্রিউ আলী একবার উত্তর আফ্রিকায় গিয়েছিলেন। ঘুরে বেড়িয়েছেন মরুপ্রান্তরে, গহন অরণ্যে। ঘুরতে ঘুরতে উপস্থিত হন মরক্কোতে।

মরক্কোর সুলতান সাদরে গ্রহণ করেন আলীকে। আলীর পৌরুষদীপ্ত চেহারা আর উজ্জ্বল দৃষ্টিতে অতিমানবীয় শক্তির সন্ধান পেলেন তিনি। সুলতান তাঁকে অনুরোধ করলেন, আমেরিকায় ফিরে যেতে। আমেরিকা চাইছে ড্রিউ আলীকে। ওখানকার নির্যাতিত কৃষ্ণাঙ্গদের ইসলামের অমেয় শক্তিতে জাগিয়ে তুলবার দায়িত্ব ড্রিউ আলীর।

আমেরিকাতে আবার তাই ফিরে এলেন ড্রিউ আলী।

সাক্ষাৎ প্রার্থী হলেন মার্কিন প্রেসিডেন্টের (সেই প্রেসিডেন্টের নাম সম্পর্কে কিন্তু কৃষ্ণ মুসলীমরা নীরব)। বললেন, মরক্কোর সুলতানের দূত হয়ে তিনি ফিরেছেন; উদ্দেশ্য, ইসলামের বাণী প্রচার করা।

প্রেসিডেণ্ট সজোরে হেসে ওঠেন আলীর বক্তব্য শুনে। বললেন: একটি ঘোড়াকে একজোড়া প্যাণ্ট পরানোর চাইতে আমেরিকাবাসী নিগ্রোদের মুসলমান করা বেশী কঠিন। (It would be as difficult getting Negroes to accept Islam as trying to fit a horse with a pair of pants.)···

ড্রিউ আলীর প্রধান বাণীগুলি সংকলিত হয়েছে একটি ছোট্ট বইতে। ইসলাম ধর্মের প্রধান ধর্মগ্রন্থের মতো এরও নাম 'পবিত্র কোরাণ' (Holy Koran)। অবশ্য মূল কোরাণের সাথে এর সাদৃশ্য খুবই সামান্য। খানিকটা কোরাণ, খানিকটা বাইবেল থেকে নেওয়া হয়েছে।

ড্রিউ আলী আমেরিকাবাসী নিগ্রোদের নতুন কথা শোনালেন। *চাঞ্চল্যকর তথ্য!* বললেন, আমেরিকার নিগ্রোরা মোটেই আফ্রিকানদের বংশধর নয়। এরা প্রত্যেকেই মরক্কোর মূরদের বংশধর। তাদের পূর্বপুরুষদের ধরে আনা হয়েছিল ফাঁদ পেতে। উত্তর আমেরিকার সস্তা দাস-মজুরে পরিণত করা হয় তাদের। নানা

ভাবেই তারা আজ অতীত ভ্রষ্ট, নিজেদের ঐতিহ্য সম্পর্কে অবহিত নয়। পৃথিবীর নির্যাতিত ইহুদিদের যেমন পৃথক সার্বভৌম রাষ্ট্রের প্রয়োজন, এই সমস্ত মূর-বংশধরদেরও তেমনি দিতে হবে স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র, পৃথক সমাজ ব্যবস্থা। সেই রাষ্ট্র কোথায়? ড্রিউ আলী বললেন, সেই রাষ্ট্র হবে উত্তর আমেরিকা। নর্থ আমেরিকা ইজ অনলি ফর দ্য নূরীশ পিপল! এখানে শ্বেতাঙ্গ-প্রভুত্বের অবসান ঘটবে, কোন শ্বেতাঙ্গের স্থান হবে না। আগুন ছড়ালেন ড্রিউ আলী। শুধু সাদারা নয় নিগ্রো খৃষ্টান ধর্মভীরুদেরও উপর খড়্গহস্ত ড্রিউ আলী। তিনি বললেন, 'নিগ্রো' শব্দের অর্থ মৃত্যু। যারা সেই মৃত্যু মেনে নিতে রাজি, তিনি তাদের ঘৃণা করেন; ওদের অবলুপ্তি অনিবার্য!

আলীর আরো বক্তব্য: জাতিকে চিহ্নিত করা উচিত ধর্ম দিয়ে। এক জাতি, এক ধর্ম। সেখানে কোন বিরোধ মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে না। ইউরোপ মহাদেশ শ্বেতাঙ্গদেরই অধিকারে থাকবে এবং তাদের এক ধর্ম,—খৃষ্টান ধর্ম। আর এশিয়া, আফ্রিকা এবং আমেরিকা মহাদেশ শাসিত হবে শুধুমাত্র কৃষ্ণাঙ্গদের দ্বারা এবং তারা একই ধর্মের বন্ধনে অটুট,—ইসলাম ধর্ম। এমন ধর্মভিত্তিক পৃথিবী বিভক্ত না হলে কোন দিন শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে না, দিনের পর দিন রক্তপাত বেড়েই চলবে!

এই হলো ড্রিউ আলী।

উত্তাপ আনলেন তিনি শীতল নিগ্রোদের মনে। হাজার হাজার শিষ্য পেলেন। যশ এলো, প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেলো। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মসজিদ তৈরী হলো। প্রভূত সম্পদের অধিকারী হলেন ড্রিউ আলী।

কিন্তু ওঁর নেতৃত্ব ও সাফল্যকে ঈর্ষা করতে শুরু করেন আর এক কৃষ্ণ মুসলীম নেতা,—শেখ ক্লাড গ্রীণ। গ্রীণ ড্রিউ আলীর

নৈতিক অধঃপতনের অভিযোগ আনলেন। দাবী জানালেন, কৃষ্ণ মুসলীমদের নতুন কাণ্ডারী হবেন তিনি নিজে।

আলী চিন্তায় পড়ে যান। গ্রীণ ক্রমশই শক্তি সঞ্চয় করছে! অঙ্কুরেই ওকে বিনাশ করা প্রয়োজন!···চিন্তাক্লান্ত ড্রিউ আলীর অস্থির পদচারণা বৃদ্ধি পায়। বিশাল অট্টালিকার শীর্ষে উঠে এলেন তিনি। ঐ দূরের একফালি কাস্তে চাঁদেব দিকে তাকিয়ে কী যেন বললেন বিড় বিড় করে। হাত দুটো মুষ্টিবদ্ধ হয়ে এলো তাঁর। মুখের প্রতিটি কঠিন রেখায় এক ভয়ানক প্রতিজ্ঞা!

দৃশ্যপট পরিবর্তিত হয়!

শেখ ক্লাড গ্রীণ নিশ্চিন্ত মনে বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। তাঁর জেহাদ ড্রিউ আলীর বিরুদ্ধে। ক্ষমতাব সব কয়টি সূতো আলীব হাত থেকে কেড়ে নিতে হবে। মস্ত ফোর্ড গাড়িখানা মসৃণ পথে সরিসৃপের মতো ছুটে চলেছে। শিকাগোর বুকে সবে রাত ঘনাতে শুরু করেছে। আজ রাতেই গ্রীণ তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা স্থির করে ফেলবেন। আট ঘাট বেধে আক্রমণ করতে হবে ড্রিউ আলীকে।

ইউনাইটেড ক্লাবের দরজায় নেমে পডলেন গ্রীণ। এটাই তাঁর কর্মস্থল, নিভৃত চিন্তার আবাস।·· নিজের ঘরে ঢুকলেন গ্রীণ। লিখবার প্যাড নিয়ে বসলেন। খচ্ খচ্ করে দু' চার কলম লিখেই থেমে যান। কপাল ঘামছে। অনিদ্রা রুগীর মতো মাথার ভিতরটা দপ দপ করছে। বাইরের হেড লাইটটাও যেন ঝলকে ঝলকে রক্তবমি শুরু করে দিয়েছে। হঠাৎ কেমন যেন ভয় পেয়ে গেলেন গ্রীণ। নিজেকে খুব একা, বিষণ্ণ আর অসহায় বলে মনে হলো। ড্রিউ আলীর বিপুল জনপ্রিয়তার বিরুদ্ধে লড়বার মতো শক্তি কোথায় তাঁর? তবে কী আপোষ করে ফেলবেন?

ভাবতে ভাবতে উঠে দাঁড়ালেন গ্রীণ। এগিয়ে গেলেন দরজার

দিকে। কিন্তু তার আগেই হঠাৎ দরজাটা খুলে গেল। আতঙ্কে শিউরে উঠলেন গ্রীণ। অস্ফুট স্বরে বললেন : কে? কী চাই?

আলখেল্লায় ঢাকা দীর্ঘদেহী এক নিগ্রো। শুধু ওর চোখ দুটো দেখা যাচ্ছে। সেখানে হায়নার হিংস্রতা। চকিতে গ্রীণের মনে হলো, এ দৃষ্টি যেন তার পরিচিত! এই চোখ দুটোই যেন তাঁকে সর্বনাশের পথে টেনে এনেছে এতদূর।

আব ভাবতে পারলেন না গ্রীণ।

তাঁর আগেই আগন্তুক ঝাঁপিয়ে পড়লো তাঁর উপর। কোন বাধা দেবার আগেই মরক্কো বাটের দীর্ঘ ছুরিটা গ্রীণের পাঁজরে আমূল বসিয়ে দেয়। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছোটে। গ্রীণের অন্তিম চিৎকারে রাতের স্তব্ধতা চিরে টুকরো টুকরো হয়ে পড়ে।

কাজ হাসিল! খুনী বন্য চিতার দ্রুততায় একলাফে বেরিয়ে আসে বাইরে। হাওয়ার মতো মিলিয়ে যায় কোথায়!···

শিকাগো শহরে ইউনাইটেড ক্লাবের পাশ দিয়ে মাঝে মাঝে আমি হেঁটে গেছি। বাড়ীটার দিকে তাকালেই শেখ ক্লাড গ্রীণের কথা মনে পড়ে যায়। ওঁর বিদ্রোহী অতৃপ্ত আত্মা যেন আজো এর অলিন্দে অলিন্দে প্রতিশোধের প্রত্যাশায় ঘুরে বেড়ায়।···

রক্তাপ্লুত গ্রীণ কিছুক্ষণ ছটফট করেই নিথর হয়ে আসেন। মরবার আগেও তাঁর চোখ দুটো আগুনের ভাটার মতো জ্বলছিল। দড়ির মতো পাকানো আঙুলগুলি অসহ্য অব্যক্ত যন্ত্রণায় কী যেন বলতে চাইছে! চার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা অনুগামীদের যেন বলতে চেয়েছিলেন : ক্ষমা নেই! ড্রিউ আলীকে তোমরা ক্ষমা করবে না!

ড্রিউ আলীর বিরুদ্ধে খুনের কেস উঠলো শিকাগো কোর্টে।

পুলিশ এসে হাতকড়া লাগালো ইসলামের প্রফেটকে।

কিন্তু আদালত প্রমাণ করতে পারলো না, শেখ ক্লাড গ্রীণের

হত্যার পিছনে আলী ছিলেন। বেকসুর খালাস পেয়ে গেলেন আলী।

কিন্তু মুক্তি পেলেন না গ্রীণের অভিশাপ থেকে।

রক্ত রাঙা দু'খানা হাত যেন ক্রমশই এগিয়ে আসছে আলীর দিকে। আর আগের মতো প্রাণচঞ্চলতা নেই আলীর। সর্বত্র চাপা সন্দেহ আর ভয়,—মৃত্যুদূতের নিশ্চিত আগমনের পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছেন তিনি।

অবশেষে প্রতিশোধ নেওয়া হলো।

গ্রীণের হত্যার মাত্র কয়েক সপ্তাহ বাদেই আলীর নিশ্চল প্রাণহীন দেহ পাওয়া গেল তাঁর ঘর থেকে। শিষ্যরা প্রচণ্ড উত্তেজনায় ফেটে পড়েঃ এ হত্যা! এটা স্বাভাবিক মৃত্যু নয়! সঠিক অনুসন্ধান চাই!

কিন্তু ততক্ষণে চির ধরেছে কৃষ্ণ মুসলীম সমাজে।

আবির্ভাব ঘটেছে আর এক শক্তিমান প্রফেট এলিজা মহম্মদের। এলিজা ড্রিউ আলীকে কোন মতেই স্বীকৃতি দিতে রাজি নন। তাঁব মতে, আলী কৃষ্ণ মুসলীমদের সর্বনাশ করে গেছেন, এত বড় ঐক্যে তিনি ফাটল ধরিয়েছেন।

ধীবে ধীরে তাই স্মৃতির পৃষ্ঠা থেকে ড্রিউ আলীর নাম অস্পষ্ট পাণ্ডুর হয়ে আসে।··

ড্রিউ আলীর সমসাময়িক মারকাস গ্রেভে। আমেরিকার ইতিহাসে তিনি ব্ল্যাক মসেস্' (Black Moses)। জ্যামাইকায় জন্ম। ড্রিউ আলীর বিরাট ছায়াকে তিনি ভয় পাননি। বরং এক স্বতন্ত্র চেতনা আনতে চেয়েছিলেন নিগ্রোদের মধ্যে। ড্রিউ আলীর মতো তিনি আমেরিকার নিগ্রোদের 'মুর' বলেননি। বরং বলেছেন, আমরা আফ্রিকারই সন্তান। তাই আফ্রিকার উন্নতিতে আমাদের

গর্ব, আফ্রিকার পতনে আমাদের অসহায়তা। আফ্রিকার মুক্তির সাথে পৃথিবীর সমস্ত কৃষ্ণাঙ্গ সমাজের মুক্তি ঘটবে। আফ্রিকা যতদিন শ্বেতাঙ্গদের পদপিষ্ট থাকবে, কৃষ্ণাঙ্গদের ততদিন মানসিক স্বীকৃতি মিলবে না।

লাতিন আমেরিকার দেশে দেশে ঘুরে বেড়ালেন মারকাস গ্রেভে। কিউবা, বলিভিয়া, প্যারাগুয়ে, পেরু সকল দেশেই ছুটে যান। ঘনিষ্ঠ আবেগে নিগ্রোদের নিত্য দুঃখের সাথী হন।

লাতিন আমেরিকা ঘুরে ইউরোপে গেলেন মারকাস। উপস্থিত হলেন লণ্ডনে। টেমস নদীর ধারে দাঁড়িয়ে দেখলেন, এখানেও কৃষ্ণ জাতির প্রবাহ। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ রক্ষার্থেও রোমান ক্রীতদাসের মতো প্রাণপাত করছেন নিগ্রোরা। লণ্ডনে মারকাসের সাথে পরিচয় হলো মিশরীয় লেখক মহম্মদ আলীর সাথে। দু'জনে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলেন নিগ্রোদের অবস্থা,—জেটিতে, ডকে, জাহাজে, খনিতে, নাইট ক্লাবে, সম্ভ্রান্ত লোকের বাড়ীতে নিগ্রোরা তাদের সস্তা শ্রম বিলি করে চলেছে। পৃথিবী জুড়ে এমন লক্ষ লক্ষ ক্রীতদাসের দল নিজেদের মৃত্যুর নোটিশ নিজেরাই লিখে চলেছে।....

মারকাসের সাথে ড্রিউ আলীর তফাৎ আসমান-জমিন। মারকাস প্রগতিবাদী, আর আলী মধ্যযুগীয় রোমাঞ্চে বিশ্বাসী। মারকাসের পড়াশুনা প্রচুর, আর আলীর পাঠ্যজীবন অতি সীমিত।

বিখ্যাত নিগ্রো নেতা বুকাব টি. , ওয়াশিংটনের আত্মচরিত 'Up from slavery' পড়ে নিজের জীবন-দর্শনকে খুঁজে পেলেন মারকাস। মারকাসের নিজের কথায়ঃ

'বুকার টি. ওয়াশিংটনের 'দাসত্ব থেকে মুক্তি' পড়ে আমার সমস্ত উচ্চাশা, সমস্ত ভাবনায়, সমস্ত স্বপ্নে এক প্রচণ্ড আলোড়ন এলো।.... আমি নিজেই প্রশ্ন করি, 'কালো মানুষদের নিজস্ব সরকার কোথায়? কোথায় তাদের রাজা, কোথায় বা তাদের রাজ্য। কোথায় তাদের

রাষ্ট্রপতি, তাদের নিজের দেশ, নিজেদের রাজদূত, নিজস্ব সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ?' এত সব প্রশ্নের কোনই জবাব নেই। তখন আমি ঘোষণা করলাম, 'এইগুলি অর্জন করবার জন্য আমি সংগ্রাম চালিয়ে যাবো !'

১৯১৪।

অগ্নিগর্ভ ইউরোপ ত্যাগ করে আবার জামাইকায় ফিরে এলেন মারকাস। জামাইকায় ফিরে নিগ্রোদের উত্তেজিত করতে থাকেন তিনি ঃ

...'পৃথিবীর সমস্ত নিগ্রো নারী-পুরুষকে আমি এক হতে আহ্বান জানাচ্ছি। লৌহ কঠিন সেই ঐক্যে সংগঠিত হবে নিগ্রোদেব সম্পূর্ণ নিজস্ব রাষ্ট্র ও সরকার।....সেই রাজ্যের নিগ্রোরা কেউ পিওন নয়, ভূমিদাস নয়, কুকুর-বেড়ালের মতো অবহেলিত ক্রীতদাস নয়। বরং এক অমেয় স্বাধীনচিত্ত ও জাতীয়তাবাদী চেতনায় লালিত নতুন মানুষের দল, বিশ্ব সভ্যতায় যাদের অবদান হবে অনস্বীকার্য !....'

হাজার হাজার কালো মানুষের সাথে পেশল হাত আকাশের দিকে তুলে চিৎকার করে উঠলেন মারকাস ঃ

একই ঈশ্বর ! একই লক্ষ্য ! একই ভাগ্য !

One God ! One Aim ! One Destiny !

মারকাসের সংগঠনে দলে দলে নিগ্রোরা এসে নাম লেখাতে থাকে। ন্যুইয়র্কে তাদের সংখ্যা ত্রিশ হাজার, শিকাগোতে নয় হাজার, ফিলাডেলফিয়াতে ছয় হাজার, ওয়াশিংটনে এক হাজার, জামাইকায় পাঁচ হাজার এবং গুয়েতেমালায় তিন হাজার। মারকাস বলতেন, আমেরিকাবাসী নিগ্রোদের নৈতিক দায়িত্ব হলো আফ্রিকার মুক্তি সংগ্রামে ইন্ধনের সৃষ্টি করা। এর জন্য প্রয়োজন প্রচুর টাকার। প্রতিটি নিগ্রোর আই ঝোঁক থাকবে ডলার সঞ্চয় কর। সেই ডলার তারা পাঠাবে

আফ্রিকায় মুক্তি সংগ্রামীদের শক্তিশালী করবার জন্য। নিগ্রোরা একই পরিবারের সন্তান,—তাদের উদ্দেশ্য অভিন্ন, একই ত্যাগের মন্ত্রে তারা দীক্ষিত।

"We are too large and great in number not to be a great people, a great race and a great nation. I cannot recall one single race of people as strong numerically as we are who have remaind so long under the tutelage of other races. The time has now come when we must seek our place in the Sun.'

'সূর্যের নীচে আমরা আমাদের দেশ গড়ে তুলবো!'

মারকাস কালো-জাতীয়তাবাদে সমুদ্রের উচ্ছ্বলতা আনলেন। নর্কিড-শাসনের গ্রানাইট পাথরকে চূর্ণ করে দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ সেই স্রোত। গহণ আফ্রিকার সন্তানরা ক্রমশই সচেতন হয়ে উঠছে। এতকালের অত্যাচার আর অনাচাবেব প্রাচীর চূর্ণ করে সিংহবিক্রমে ছড়িয়ে পড়তে চাইছে তারা।

ভাবতেও অবাক লাগে। নিগ্রো-জাতীয়তাবাদে কত ধারা, কত স্রোত! অধিকাংশই পরস্পর বিপরীতধর্মী। কিন্তু এক অর্থে তারা অভিন্ন; তা হলো এই যে, শ্বেতাঙ্গ-শোষণের হাত থেকে মুক্তি অর্জন করতে হবে!

জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌঁছে মারকাস গ্রেভে কতকগুলি দুঃসাহসিক কাজে হাত দেন। ১৯২০ সালে ন্যুইয়র্কে এক প্রকাণ্ড নিগ্রো সম্মেলন আহ্বান করলেন তিনি। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে নিগ্রো প্রতিনিধিরা যোগ দিলেন সেই সভাতে। আফ্রিকার মুক্তির জন্য একটি সরকার গঠিত হলো আলোচনার মাধ্যমে। মারকাস গ্রেভে

হলেন এর প্রেসিডেণ্ট। তাঁর বেতন নির্ধারিত হলো বার্ষিক বাইশ হাজার ডলার।

এই তথাকথিত 'আফ্রিকান রিপাব্লিকের' জন্য অর্থ সংগ্রহ করতে থাকেন মারকাস। কতকগুলি ব্যবসায়িক সংস্থা খুললেন তিনি। আফ্রিকার স্বাধীন রাজ্যগুলির কাছে দূত পাঠালেন, কারিগরী সাহায্য পাঠাতে চাইলেন, চাইলেন আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি।

এমন অবস্থা বেশীদিন মার্কিন সরকার মুখ বুজে সহ্য করতে পারে না। তার সাম্রাজ্যবাদী বন্ধুর দল,—বৃটেন, ফ্রান্স বা জার্মানীর গোসা হতে পারে! মার্কিন সরকার তাই মারকাসকে নিষেধ করলেন, অমন 'স্বাধীন আফ্রিকার স্বপ্নে' মশগুল থাকতে! কিন্তু মারকাস গ্রেভে রাজি হলেন না,—তাঁর আদর্শের পূতাগ্নি তিনি নিজের হাতে নিভিয়ে দিতে রাজি নন!

তাই একদিন কয়েদ করা হলো মারকাসকে।

নিদারুণ হতাশায় যেন ভেঙ্গে পড়লো জাতীয়তাবাদী নিগ্রোরা। আমেরিকা থেকে বিতাড়িত হলেন মারকাস। এ দেশের অবাঞ্ছিত মানুষ তিনি। আটলাণ্টায় আশ্রয় নিলেন মারকাস গ্রেভে। শত শত ক্লিষ্ট নিগ্রোর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন:

'যদি আমি আটলাণ্টায় শেষ শয্যা নেই, আমার কাজ থেমে যাবে না। বরং, তা নতুন উদ্যমে শুরু হবে। আমার আত্মার মৃত্যু নেই, আমি পরম পরিতৃপ্তির সাথে দেখবো, আফ্রিকা তার গৌরবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মৃত্যুর পর আমার মৃতদেহটিকে লাল, কালো এবং সবুজ কাপড় দিয়ে মুড়ে দেবেন আপনারা। সেই আচ্ছাদন মুক্ত করে পরমপুরুষের আশীর্বাদ নিয়ে আবার আমি জেগে উঠবো। আমার হাজার হাজার নিপীড়িত ভাইদের বিজয়ের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে আমি আবার আসবো,—আবার!....'

আটলাণ্টা থেকে জামাইকা, জামাইকা থেকে লণ্ডনে উপস্থিত হলেন মারকাস গ্রেভে। ১৯৪০ এর লণ্ডন,—নাৎসী আক্রমণের কেন্দ্রভূমি। নর্মাণ্ডির উপকূল থেকে ধেয়ে আসছে একটির পর একটি রকেট। প্রচণ্ড অগ্নিঝরা বিস্ফোরণে অহরহ কেঁপে ওঠে লণ্ডন। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাড়ীগুলি ধ্বসে পড়ছে। রাতের প্রেতপুরী লণ্ডন যেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে।

যুগের সেই কান্না শুনতে শুনতে চোখ বুজলেন মারকাস গ্রেভে। মুষ্টিমেয় শিষ্যরা কালো পোষাক পরে ঘিরে দাঁড়ালেন তাঁর মরদেহকে। লাল, কালো এবং সবুজ কাপড় দিয়ে মুড়ে দিলেন কফিনটিকে। কিন্তু আর সজীব হয়ে উঠলেন না মারকাস, শোনা গেল না সেই অক্লান্ত কণ্ঠস্বর ঃ

'....মৃত্যুর পর আমার মৃতদেহটিকে লাল, কালো এবং সবুজ কাপড় দিয়ে মুড়ে দেবেন আপনারা। সেই আচ্ছাদন মুক্ত করে পরমপুরুষের আশীর্বাদ নিয়ে আবার আমি জেগে উঠবো। আমার হাজার হাজার নির্যাতিত ভাইদের বিজয়ের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে আমি আবার আসবো,—আবার !.. '

মারকাস গ্রেভের মৃত্যুর পর কিন্তু আর তাঁর শিষ্যরা পারলো না আফ্রিকার জন্য আমেরিকায় ঝড় তুলতে। আর বিশ্বব্যাপি নিগ্রো সম্মেলনে কেউ এগিয়ে এলেন না।

মারকাস গ্রেভের কিছু কিছু অনুগামীরা উত্তর আমেরিকায় ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজে ছড়িয়ে আছে। কিন্তু ওদের কার্যকলাপ খুবই সীমাবদ্ধ। মারকাসের নাম ঘরে ঘরে শ্রদ্ধার সাথে উচ্চারিত হয়,— নিগ্রো জাতীয়তাবাদের তিনি এক বিরাট কর্মযোগী। কিন্তু তাঁর বিশ্বজোড়া পরিকল্পনাকে বাস্তব রূপ দিতে আর কোন নিগ্রো পুরুষের আবির্ভাব ঘটলো না।

হারলেম, শিকাগো ইত্যাদি শহরে গ্রেভে-পন্থীদের সমবেত হতে

দেখা যায়। তারা আলোচনা করে, মুখপত্র বের করে গ্রেভের বক্তব্যকে তুলে ধরে। কিন্তু শক্ত সমর্থ সংগঠনের অভাবে আর তারা তেমন সাড়া তুলতে পারছে না। বর্তমান মারকাস গ্রেভের অনুগামীদের শ্রেষ্ঠ নেতা হলেন চার্লস্ এ. কুকস্। তিনি সম্প্রতি আমেরিকার নিগ্রোদের কাছে ঘুরে ঘুরে চাঁদা তুলছেন মারকাসের নামে একটি স্মৃতিসৌধ গড়ে তুলতে।···

ফাদার ডিভাইনের পর ড্রিউ আলী আর ড্রিউ আলীর পর মারকাস গ্রেভে। এবার আসতে হয় ওয়ালেচ ডি. ফ্রাডের আলোচনায়। ১৯৩০এ কৃষ্ণ মুসলীমদের অদ্বিতীয় নেতা হয়ে উঠলেন এই লোকটি। অনেক অলৌকিক ঘটনার নায়ক রূপে তাঁর পরিচিতি। তিনি নিজেই ঘোষণা করলেন ঃ

'আমি ওয়ালেচ, ডি. ফ্রাড।···আগমণ আমার ইসলামের শ্রেষ্ঠ পীঠভূমি পবিত্র মক্কানগরী থেকে। নিজের সম্পর্কে আপনাদের কাছে এখন বিশেষ কিছু বলবো না, কারণ সে সময় এখনো হয় নাই। শুধু জেনে রাখুন, আমি আপনাদের অতি আপন জন,—আপনাদের ভাই। রাজকীয় সম্মানদণ্ড নিয়ে আমি আপনাদের সামনে আসিনি। সেটা ক্রমপ্রকাশ্য।····'

উত্তর আমেরিকার কৃষ্ণা মুসলীম সমাজে চাঞ্চল্য দেখা যায়।

ড্রিউ আলীর পর আবার এক শক্তিমান নেতার সন্ধান পেয়ে গেছে তারা। ফ্রাডের নাম তাদের মুখে মুখে। ফ্রিউ আলীর মতো ফ্রাডও সাদা মানুষকে ঘৃণা করেন,—ওরা 'গুহাবাসী' (Cave man), 'শয়তান' (Satan), অথবা 'ককেসিয়ান বদ' (Caucasian devil)।

ফ্রাড স্বর্গীয় হাসি হেসে বলেন ঃ জন্ম আমার মক্কায় এক কোরিস উপজাতির ঘরে। ইসলাম ধর্মের আদি প্রচারক হজরত মহম্মদেরও জন্ম হয়েছিল কোরিস পরিবারে।....তবে আমাকে আপনারা দূরের

মানুষ মনে করবেন না। আমি আপনাদের অতি ঘনিষ্ঠ, আপনাদের আত্মীয়।’

ফ্রাড নিগ্রো হলেও গায়ের রঙ মিশকালো নয়। একটু যেন বাদামী আভা লেগে আছে তাঁর শরীরে। দীর্ঘ দেহ, অটুট স্বাস্থ্য, ভরাট গলা। অভিজ্ঞতায় চোখের দৃষ্টি চতুর, কথায় কথায় ইতিহাস আর দর্শন টেনে উপমা দেন। পড়াশুনাও কম নয়। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসের পাঠ নিয়েছেন ; লস এনজেলসে বসে লাভ করেছেন কালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনে স্বীকৃতি।

কিছুদিন রাজনীতিও চর্চা করেছেন,—কূটনীতিজ্ঞ হবার সম্ভাবনা ছিল কম নয়। কিন্তু হয়ে পড়লেন ইসলামের প্রচারক।

বিভিন্ন নামে মার্কিন দেশে ফ্রাডের পরিচিতিঃ ওয়ালি ফ্রাড, প্রফেসর ফ্রাড, ফ্যারাড মহম্মদ, এফ. মহম্মদ আলি, এমন কি, ‘আল্লা’ নামেও শিষ্যরা তাঁকে ডেকে থাকে।

মধ্যবয়সে ফ্রাড যখন শিকাগোতে এলেন, তখন তিনি আর সাধারণ মানুষ নন। কৃষ্ণ মুসলীমরা তাঁর ভিতর দেবত্ব আরোপ করেছেন। কিন্তু ১৯৩৫ এর শিকাগো শহরে শোচনীয় সাদা-কালোর দাঙ্গায় মার্কিন গোয়েন্দা দপ্তর ফ্রাডের নাম খুঁজে পায়। আল্লা টেম্পেলের কৃষ্ণ মুসলীমরা সেবার শ্বেতাঙ্গ-নিধনে নেমেছিল।

পুলিশ তন্ন তন্ন করে কৃষ্ণ মুসলীমদের কাগজপত্র পরীক্ষা করে। এতে কতকগুলো নাম তারা পায়। যেমন, মহম্মদ ফ্রাড, ওয়ালেচ ডি. ফ্রাড এবং এলিজা মহম্মদ। গোয়েন্দা দপ্তরের ধারণা, এঁরা একই লোক ; বিভিন্ন নামে বিভিন্ন জায়গায় পরিচিত। সত্যিই কি তাই? এ প্রশ্নের জবাব পাওয়া কঠিন। কারণ, কঠিন গোপনীয়তা কৃষ্ণ মুসলীম সংগঠনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

১৯২০ সালে এই শিকাগো শহরে প্রথম বীভৎস বর্ণবিদ্বেষী দাঙ্গার সূত্রপাত। প্রথম সংঘর্ষ অবশ্য বেধেছিল নিগ্রোদের সাথে নিগ্রোদেরই। নিগ্রো জাতীয়তাবাদের তুটি শাখা পরস্পর মারমুখী হয়ে ওঠে। এদের একটি দল মারকাস গ্রেভের অনুগামী,—তাদের বিশ্বাস আফ্রিকান প্রগতীতে; আর একটি দল ড্রিউ আলী ও ফ্রাডের শিষ্য,—তারা নিজেদের পরিচয় দেয় 'মূর' জাতির বংশধর হিসেবে। প্রথম দল খৃষ্টান, দ্বিতীয়দল কৃষ্ণ মুসলীম।

২০শে জুন, ১৯২০। রবিবার। মধ্যবেলায় একটু যেন ঝিমিয়ে পড়েছে শিকাগো। হঠাৎ পিস্তলের গর্জনে সচকিত হয়ে উঠলো শিকাগোর মূল রাজপথ। তুটি দীর্ঘদেহী কৃষ্ণ মুসলীম লুটিয়ে পড়ে রাস্তার উপর। ওদের মসৃণ সিল্কের আলখেল্লা ভিজে যায় তাজা রক্তে; বুলেট-বিদ্ধ যন্ত্রণায় হিম হয়ে আসে ওদের সমস্ত অনুভূতি।

আগুন জ্বলে উঠলো যেন আল্লা টেম্পেলে।

দাঁতে দাঁত ঘর্ষণে আপোষহীন জেহাদ ঘোষিত হলো। ড্রাম বেজে ওঠে যুদ্ধের। নাকাড়া বাজে 'ডিম....ডিম....ডিম....'। শত শত সশস্ত্র মুসলীম শিকাগোর পথে মার্চ করে এগিয়ে চললো। হের হিটলার পরিচালিত এম. এ. বাহিনীর দল যেন। ওরা জড়ো হয় খোলা ময়দানে। আমেরিকার তুটি জাতীয় পতাকায় আগুন ধরিয়ে দেয়। পুড়িয়ে ফেলে একখণ্ড মার্কিন সংবিধান। একজন নিগ্রো পুলিশকে ধরে বেদম মার দেওয়া হলো। তুটো বড় বড় দোকান লুঠ হয়। পাঁচজন শ্বেতাঙ্গ মারাত্মক আহত হলো।

খৃষ্টান নিগ্রোদের সাথে মুসলীম নিগ্রোদের দাঙ্গার শুরু।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। আজো সেই আগুন নেভেনি; বরং বেড়েই চলেছে। কৃষ্ণ মুসলীমরা নিজেদের 'আবেসিনীয়ান' বলে স্থির করে। কাজেই খৃষ্টান নিগ্রোদের সাথে তাদের কোন রক্তের সম্পর্ক আছে বলে স্বীকার করে না।

অনেক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও কৃষ্ণ মুসলীমদের সংখ্যা দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। সংগ্রামের বহ্নিমুখে আজ একটি নামই দারুণ আলোড়ন আনে,—এলিজা মহম্মদ। টেলিভিসনের পর্দায় গভীর মনোযোগের সাথে এলিজার কথা আমি শুনেছি। তাঁর নিখাদ কণ্ঠস্বরে আত্মকথন ফুটে উঠেছে ঃ

'১৯৩৪এর এপ্রিলে পুলিশ আমায় হঠাৎ গ্রেপ্তার করলো। কি অপরাধ? অপরাধ এই যে, আমি আমার কোন সন্তানকেই মার্কিন সরকারের পাবলিক স্কুলে পাঠাতে রাজি হইনি। রাজি হবো কেন? আমার তো কোন আস্থা নেই এদের শিক্ষা ব্যবস্থায়। আমি আমার সমাজের লোকদের নিয়ে নতুন স্কুল খুলছি, নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলছি। দরকার নেই আমাদের ঐ সব মেকী ডিগ্রি বা ডিপ্লোমার। The Time পত্রিকা আমার ব্যক্তিগত জীবনের অনেক কুৎসা রটাতে শুরু করলো। অথচ আপনারা জানেন, আমি কী এবং আমার আদর্শে বিশ্বাসী কত লক্ষ মানুষ এই যুক্তরাষ্ট্রে বাস করে।....'

মহম্মদের তিক্ত আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করা সহজ নয়। লক্ষ লক্ষ কৃষ্ণ মুসলীম তাঁর অনুচর। তাঁর সামান্য ইঙ্গিতে এরা আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়তে রাজি। ডলারেরও অভাব নেই; পারস্পরিক সহায়তায় প্রাচুর্য এসেছে কৃষ্ণ মুসলীম সমাজে। ভাস্কর্যের অনুপম চিহ্ন নিয়ে শিকাগো শহরের বুকে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে দ্বিতীয় আল্লা টেম্পেল।

এলিজা মহম্মদ অহেতুক কথা বলেন না। কিন্তু আঘাত এলে দ্বিগুণ তেজে প্রত্যাঘাত করেন। যেমন ১৯৩৫ এর ৫ই মে মার্কিন সরকারের সমালোচনার জবাবে কৃষ্ণ মুসলীমদের রক্তাক্ত দাঙ্গায় লেলিয়ে দিয়েছিলেন এলিজা মহম্মদ। যেন শিকাগোর মাটি ফুঁড়ে উঠে এসেছিল শত শত ব্ল্যাক মুসলীম। প্রত্যেকেই মারাত্মক

অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত। মহাকালের অনুচর যেন সব। রে রে শব্দে ঝাঁপিয়ে পড়লো পুলিশ হেড কোয়ার্টারের উপর। অতর্কিত আক্রমণে পুলিশরা দিশাহারা। বাধা দিতে গিয়ে প্রাণ হারালেন উচ্চ পদস্থ পুলিশ অফিসার ক্যাপ্টেন যোশেফ। কৃষ্ণ মুসলীমদের বেপরোয়া গুলিবর্ষণে লুটিয়ে পড়লো আরো দু' জন কনেস্টবল এবং পাঁচ জন পথচারি। আহতদের সংখ্যা শতাধিক।

মার্কিন সরকার সচকিত হয়ে উঠলো এই বীভৎস আক্রমণে। দঙ্গল দঙ্গল পুলিশ ছুটে আসে কৃষ্ণ মুসলীমদের দমন করবার জন্য। বেছে বেছে তেতাল্লিশ জনকে এ্যারেষ্ট করা হল।

এরই কিছুদিনের মধ্যে শিকাগো-কোর্ট প্রাঙ্গণে আর এক দফা রক্তপাত ঘটে গেল। একদল কৃষ্ণ মুসলীমকে ঘিরে ফেলেছে প্রায় শ' দুয়েক পুলিশ। পিস্তল লড়াইতে মারা গেল পাঁচজন নিগ্রো। বাকী সকলকে কয়েদ করে চালান দেওয়া হলো অন্য শহরে।

ওয়াশিংটনের সদর দপ্তর থেকে আদেশ এলো ঃ অপরাধীদের খুঁজে বের করো। শিকাগোর মসজিদে ব্যাপক খানাতল্লাসি চললো। কিন্তু আশ্চর্য! একটিও পাইপ গান, পিস্তল বা হাতবোমা আবিষ্কৃত হলো না! কোন সঠিক অপরাধীকে সনাক্তও করা গেল না। জেলের ভিতর দৈহিক নির্যাতন চললো কৃষ্ণ মুসলীমদের উপর। কিন্তু মুখ খুললো না কেউ। প্রমাণের অভাবে মুক্তি পেয়ে গেল সকলে।

কিন্তু সেই থেকে এলিজা মহম্মদের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখলেন মার্কিন সরকার। সুযোগ পেলেই বন্দী করবেন। সুযোগ এলো ১৯৪২ সালে। সংবিধান-অপমানের অপরাধে এলিজা গ্রেপ্তার হলেন।

বন্দীত্ব দীর্ঘ চার বৎসর,—১৯৪২ থেকে ১৯৪৬; শিকাগো জেলের টাওয়ারের দিকে নিষ্কম্প দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকেন এলিজা। যেন শক্তি প্রার্থনা করছেন আল্লার কাছে।

কৃষ্ণ মুসলীম নেতার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ এনেছেন মার্কিন সরকার।

এক নম্বর, তিনি মার্কিন সংবিধানকে অপমান করেছেন।

দুই নম্বর, তিনি গৃহযুদ্ধের আবহাওয়া সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন।

তিন নম্বর, তিনি জাপানীদের গুপ্তচর হিসাবে এখানে অন্তর্ঘাত-মূলক কাজ করে চলেছেন।

কৃষ্ণ মুসলীমদের প্রধান প্রধান মসজিদগুলির দরজা বন্ধ করে দেওয়া হলো। এলিজা মহম্মদের অনুপস্থিতিতেও দলের কাজকর্ম ঠিকই চলতে থাকে। তাঁর স্ত্রী ক্লারা মহম্মদ প্রায়ই এসে দেখা করে যান স্বামীর সাথে। মহম্মদের প্রতিটি নির্দেশকে জানিয়ে দেন কৃষ্ণ মুসলীম সমাজকে। মহম্মদ তাদের শান্ত ও সংযত থাকতে বলছেন। বিপদের মেঘ শীঘ্রই কেটে যাবে। কৃষ্ণ মুসলীমদের অবরুদ্ধ স্রোত আবার মুক্তি পাবে। মার্কিন সরকারের সাধ্য নেই এলিজা মহম্মদকে স্তব্ধ করে দেবার।....

১৯৪৬এ মুক্তি পেলেন এলিজা মহম্মদ।

আবার ব্যাপক উদ্দীপনায় স্ফীত হয়ে ওঠে কৃষ্ণ মুসলীমরা। একটি পর একটি জমকালো মসজিদ তৈরি হতে থাকে শিকাগো, মিলওয়েকী, ওয়াশিংটন, ডেট্রয়ট ইত্যাদি শহরে। কোরিয়া যুদ্ধের সময় এলিজা মহম্মদ মার্কিন সরকারের নীতিকে 'যুদ্ধবাজ' বলে ব্যাখ্যা করেন। ঘোষণা করেন, এই যুদ্ধের সামিল হতে কোন কালো মুসলমান রাজি নয়।

প্রতিটি আল্লা টেম্পেল কৃষ্ণ মুসলীমদের এক একটি সুদৃঢ় সংগঠন। এদের সঠিক সদস্য সংখ্যা জানা যায়নি। তবে সংখ্যা যে বেড়েই চলেছে তা বেশ বোঝা যায়। এমন দিন হয়তো আসবে, যখন মার্কিন সরকারের আর ক্ষমতা থাকবে না কৃষ্ণ মুসলীমদের দমন করবার। প্রতি তিন শ' জন নিগ্রোর মধ্যে একজন অন্ততঃ

কৃষ্ণ মুসলীম। এলিজা দাবী করেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তাঁর সমর্থক সংখ্যা কমপক্ষে দশ লক্ষ!

দশ লক্ষ সমর্থ ঐক্যবদ্ধ নিগ্রো পুরুষ কী না করতে পারে? শুধু যুক্তরাষ্ট্র কেন, সমস্ত পৃথিবী তারা জয় করতে পারে।

প্রপাগাণ্ডার চূড়ান্ত করছেন এলিজা মহম্মদ। পাবলিক ফোরাম, সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিসন ইত্যাদির মারফৎ কৃষ্ণ মুসলীমদের পরিচিতি দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। বছরে একবার এলিজা মহম্মদ বিভিন্ন মসজিদে জণসমক্ষে আবির্ভূত হন। সেদিন কৃষ্ণ মুসলীমদের মধ্যে উল্লাস ও উদ্দীপনার অন্ত থাকে না। দশ থেকে পনেরো হাজার নিগ্রো এক একটি মসজিদে দাঁড়িয়ে এলিজার বাণী গ্রহণ করে।

১৯৬০ সালে শিকাগো শহরে কৃষ্ণ মুসলীমদের বাৎসরিক সভা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। সেই সভায় উপস্থিত ছিল প্রায় পনেরো হাজার এলিজা মহম্মদের অনুগামী।....

কিছুদিন আগেও শ্বেতাঙ্গ সমাজ কৃষ্ণ মুসলীমদের প্রসার সম্পর্কে মোটেই অবহিত ছিল না। এদের শক্তি সম্পর্কেও একটা ভুল ধারণা ছিল।

১৯৫৯ সালের জুলাই মাসে বিদগ্ধ চিত্র পরিচালক মাইক ওয়ালেচ সর্বপ্রথম কৃষ্ণ মুসলীমদের উপর একটি তথ্যপূর্ণ ছবি ক'রে সাধারণ মানুষকে সজাগ করে দেন। ছবিটির নাম ছিল "The Hate That Hate Produced."

মাইক ওয়ালেচের ছবি দেখে অনেকেই কৃষ্ণ মুসলীমদের সম্পর্কে উৎসাহিত হয়ে ওঠেন। অনেক মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে থাকে Time, The Reader's Digest, Cosmopolitan, U. S. News, World Report, New york Times ইত্যাদি প্রথম শ্রেণীর সংবাদপত্র সমূহে। কৃষ্ণ মুসলীমদের সম্পর্কে তাঁরা বললেন: এটা হচ্ছে এক ধূমায়িত মার্কিন-বিরোধী, শ্বেতাঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন।

আমেরিকার মাটিতে মুসলীম সমাজ দৃঢ়ভাবে শিকড় গেড়েছে এবং এলিজা মহম্মদ হলেন এর অদ্বিতীয় নেতা।

'The Nation of Islam appears to be firmly established and Muhammad remains its unchallenged leader.'....

রক্তাভ পশ্চিম আকাশের দিকে তাকিয়ে এলিজা মহম্মদ দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলেন। জীবন ও জগতের ক্রমাগত আবর্তনে জাতির ভবিষ্যৎ যেন তিনি ধ্রুবসত্যে জানতে পারছেন। এতদিনের আবছা ধোঁয়া ধোঁয়া রূপটা আজ সত্যিই বাস্তবে পরিণত হয়েছে। নতুন নতুন শিষ্য আসছে; প্রভাব-পতিপত্তি, বিলাস ও বৈভবের অন্ত নেই! আরো—আরো অনেকদিন বাঁচতে ইচ্ছে করছে! বটবৃক্ষের আয়ু নিয়ে দেখতে চাইছেন তিনি, সমগ্র উত্তর আমেরিকা নিগ্রো মুসলীমদের করায়ত্ত হতে চলেছে!

ভাবতে ভাবতে জর্জিয়ার সন্তান এলিজা মহম্মদের দৃষ্টি ক্রমশ স্বপ্নালু হয়ে ওঠে। এক নাগাড়ে জীবনের অতীত পৃষ্ঠাগুলি পড়তে থাকেন তিনি।

১৮৯৭ সালের ১০ই অক্টোবর জর্জিয়ায় তাঁর জন্ম। কিশোর বয়সে চলে আসেন আটলান্টায়। বাইশ বৎসর বয়সে জর্জিয়ার নিগ্রো-সুন্দরী ক্লারা ইভামকে বিয়ে করলেন। বিয়ের চার বছরের মধ্যে দুটি সন্তানের জনক হলেন তিনি।

শুরু হলো দারিদ্র্যের সাথে লড়াই, বর্ণবিদ্বেষী শ্বেতাঙ্গদের দ্বারা অপমান, জীবনে নিরাপত্তার একান্তই অভাব। রুটির সন্ধানে প্রাণপাত পরিশ্রম করতেন এলিজা। কখনো তিনি ক্ষেত-মজুর, কখনো রেলস্টেশনের মুটে, আবার কখনো বা নকল-নবীশ। একটা দামী ওভারকোট পর্যন্ত তাঁর ছিল না। স্থান থেকে স্থানান্তরে ঘুরতে ঘুরতে ওয়াশিংটনে উপস্থিত হলেন এলিজা।

এখানেই তাঁর সাথে মুসলীম সমাজের নেতা ফ্রাডের পরিচয় হয়। ফ্রাডের আশীর্বাদেই শুরু হলো তাঁর উন্নতি। ফ্রাডও বুঝলেন, পরিশ্রমী এলিজার নেতৃত্ব অপরিহার্য। কৃষ্ণ মুসলীমদের গুরুত্বপূর্ণ সভাগুলিতে ফ্রাডের সাথে এলিজাও যেতে শুরু করেন।....

নাতিদীর্ঘ দেহ, কিন্তু বেশ সবল মানুষ এলিজা মহম্মদ। নিজেই বলেন 'বেশী পড়াশুনা করবার সুযোগ আমি পাইনি।'

পারিবারিক জীবনে এলিজা মহম্মদ তাঁর স্ত্রী ক্লারা মহম্মদের বুদ্ধিমত্তার উপর খুব নির্ভরশীল। বাইবের সংগ্রামী জীবনেও ক্লারা তাঁকে নানাভাবে সহায়তা করেছেন। দলের সাংগঠনিক কাজকর্মে স্ত্রীর অবদান সম্পর্কে প্রায়ই বলে থাকেন এলিজা মহম্মদ। তাঁদের ছ'টি ছেলে এবং দুটি মেয়ে। নাতি-নাতনির সংখ্যা সাতাশ জন।

বাগদাদের খলিফার চাইতেও আজ বেশী প্রাচুর্য এলিজা মহম্মদের। শিকাগোর হাইড পার্কে প্রাসাদপম অট্টালিকায় তাঁর বাস। পর পর আটটি সুসজ্জিত ঘর তাঁর ব্যক্তিগত প্রয়োজনে রক্ষিত। তৃতীয় ফ্লোরে কৃষ্ণ মুসলীমদের কার্যালয়; সব সময় লোকজনে যেন গম গম করছে।

এলিজার ছয়জন প্রাইভেট সেক্রেটারী। তিনটি প্রকাণ্ড ঝকঝকে কার—হলুদ ক্যাডিলাক, নীল ক্যাডিলাক এবং লিঙ্কন কনটিনেন্টাল কার।

সাধারণত এলিজা কালো বা ধূসর রঙের স্যুট পরে থাকেন, মাথায় থাকে ফেজ টুপি। টুপিতে খচিত আছে সূর্য, তারা এবং চাঁদ। কথা বলেন খুব আস্তে, কিন্তু যথেষ্ট দৃঢ়তা নিয়ে।

প্রতিটি কৃষ্ণ মুসলীম চেষ্টা করে তাঁকে অনুসরণ করবার, অমন পরিশ্রমী এবং ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হবার। এমন কি, এলিজার চলাফেরা, বাচনভঙ্গী পর্যন্ত কালো. মুসলমানরা অনুকরণ করবার চেষ্টা করে। প্রতিরাতে প্রাইভেট সেক্রেটারীরা এসে মহম্মদের নির্দেশ নিয়ে

যান। সাধারণ সদস্যদের সাথে এলিজার কোন সরাসরি যোগাযোগ নেই।

সাংবাদিকদের পারতপক্ষে এড়িয়ে যান এলিজা মহম্মদ। তবে কয়েকজন সাংবাদিক তাঁর সাথে কথা বলে নতুন ধারণা নিয়ে ফিরে আসেন। তাঁদের বর্ণনায় জানা যায়, মানুষ হিসাবে এলিজা মহম্মদ মোটেই প্রতিহিংসাপরায়ণ বা অভদ্র নন। বরং বেশ সংযত ও রুচিশীল। প্রথমে ধর্মতত্ব নিয়ে আলোচনা শুরু করলেও ক্রমশ তাঁর চিন্তাধারা বিস্তৃত হয়ে পড়ে অন্যান্য বিষয়গুলিতেও। তিনি আলোচনা করেন জাতির স্বাস্থ্য সম্পর্কে, বাসগৃহের অভাব সম্পর্কে; নিগ্রোদের স্বল্প আয় এবং নৈতিক অবনতির কথাও দুঃখের সাথে উচ্চারণ করেন। মহম্মদ সবিনয়ে বলেন, ঐতিহাসিক প্রয়োজনেই তাঁর এই আন্দোলন। হৃতবল, হৃতমান কৃষ্ণ জাতিকে রক্ষার আর দ্বিতীয় পথ ছিল না।....

এলিজা মহম্মদের বয়স হয়েছে। যদিও সুস্থ ও সবল, তবু আজকাল চলাফেরায় কষ্ট হয়। বেশীক্ষণ বক্তৃতা দিতে গিয়ে হাঁপিয়ে ওঠেন। কৃষ্ণ মুসলীম সমাজেও তাই চিন্তার মেঘ ঘনায়মান ঃ এলিজা মহম্মদের উত্তরাধিকারী কে ?

অনেকেরই বিশ্বাস, তিনিই ইসলামের শেষ দূত। কিন্তু এলিজা মহম্মদ নিজে অন্য কথা বলে থাকেন, বলেন 'আমার আরব্ধ কাজ শেষ হয়নি। হয়তো আমি নিজে তা শেষ করে যেতে পারবো না। কাজেই আমার পর আর একজন উপযুক্ত নেতার প্রয়োজন হয়ে পড়বে।'

কে সেই লোক ?

একটি নাম এই প্রসঙ্গে খুব উচ্চারিত,—মিনিস্টার ওয়ালেচ। মিচিগানের লোক। কৃষ্ণ মুসলীম সমাজে খুবই জনপ্রিয়। মনে হয় বিনা বাধায় তিনি এলিজা পরিত্যক্ত সিংহাসনে গিয়ে বসতে পারবেন।

সুতরাং এই কালো স্রোত চলছে এবং চলবে। শক্তি ও সংখ্যা বেড়ে চলেছে। জানি না, এদের আদর্শ আর এতখানি চরমপন্থী থাকবে কি না। যদি দৃষ্টিভঙ্গীতে কোন পরিবর্তন না আসে, তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ সর্বনাশা সম্ভাবনায় রক্তাক্ত হতে চলেছে। পাঁচ বৎসর শিকাগো শহরের বুকে বাস করে এই বিশ্বাস নিয়েই আমি ফিরে যাচ্ছি।

॥ ছয় ॥

এ যুগের অন্যতম চিন্তা-নায়ক, ফরাসী দার্শনিক জঁা পল সার্তে বলেছেন: যতদিন একজন নিগ্রো শিশুও দুধ ও পুষ্টিকর খাবারের অভাবে শুকিয়ে মরবে, ততদিন আমার সাহিত্য রচনা ব্যর্থ বলেই জানবো!

মনের সমস্ত আবেগ নিয়ে এই উক্তির প্রতি সমর্থন জানাতে হয়। কালো 'ঘেটো' গুলিতে রিকেটী নিগ্রো শিশুদের যেন মেলা বসেছে। মার বুক অপরিপুষ্ট,—মাই না পেয়ে সদ্যজাত শিশুর অসহনীয় গোঙানি।

আবার স্তব্ধ বিস্ময়ে দেখতে হয়, ন্যূইয়র্ক, শিকাগো, ওয়াশিংটনের বাড়ীগুলি আকাশকে ধরবার আশায় ক্রমশই মাথা ঠেলে উঠছে। ক্যাডিলাক, শেভ্রোলেট, ফোর্ড, মার্সিডিসের দল সরিসৃপের মতো সাঁ সাঁ শব্দে ধেয়ে চলেছে। বার আর নাইট ক্লাবগুলিতে ডলারের ছড়াছড়ি, নিশাসখীদের নিতম্বের দোল এবং নিপীত গ্লাসের ঠুং ঠাং শব্দ!

এ সবই জরাজীর্ণ অবক্ষয়ের চিহ্ন।

কিন্তু এ দেশে সৎ ও চিন্তাশীল মানুষেরও অভাব নেই। অনেকেই জাতির ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবেন এবং ভেবে আশঙ্কা প্রকাশ করেন। আমাদের এক অধ্যাপক ডঃ মূলার বার্ণকে দেখেছি, প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ ছাপিয়ে জাতিকে তিনি হুঁশিয়ার করে দিচ্ছেন। বস্তুবিজ্ঞানে ডিগ্রি পাবার পর প্রফেসর বার্ণের বাড়ীতে গিয়েছিলাম। বয়স তাঁর ষাটের কম নয়, মাথার চুল দুগ্ধ-ফেনিল, চুরুটের ধোঁয়া ছেড়ে কথা বলেন গলা কাঁপিয়ে।

আমি তাঁর ড্রয়িং রুমে গিয়ে বসলাম। দেয়ালে পিকাশো—

পেইন্টিং, টেলিভিসনের পর্দায় কেনেডির জীবনী দেখানো হচ্ছে। বার্ণ তন্ময় হয়ে দেখছেন। আমাকে হাতের ইশারায় বসতে বললেন।

চেয়ারে বসে কেনেডি-আলেখ্য দেখতে থাকি।—লক্ষ লক্ষ শান্তির পায়রা উড়ছে।—বক্তৃতা মঞ্চে উঠে এলেন জন কেনেডি। এবার শুরু হবে তাঁর দীর্ঘ ভাষণ।....

হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন বার্ণ।

বোতাম ঘুরিয়ে বন্ধ করে দিলেন টেলিভিসনটি।

আমি অবাক। জিজ্ঞাসা করলামঃ হঠাৎ বন্ধ করে দিলেন কেন?

বার্ণ তিক্ত স্বরে বললেনঃ এ পর্য্যন্ত দেখা যায়; এর পরে যা দেখাবে, তা না দেখাই ভালো।

বার্ণের কথার অর্থ বুঝতে পারলাম না। তাই আবার জিজ্ঞাসা করিঃ কেন?

আসন নিতে নিতে বার্ণ বললেনঃ এরপর যা দেখাবে, তা নিছক প্রোপাগাণ্ডা,—কমিউনিস্ট বিরোধী প্রচার ছাড়া আর কিছু নয়। এরা এতো বায়াস্ট!

ডঃ বার্ণের মতো আমেরিকার হাজার হাজার বুদ্ধিজীবীরা আজ মার্কিন-সরকারের মিথ্যা প্রচারের ঢক্কা-নিনাদে তিক্ত, বিরক্ত। ভিয়েতনামে নর-হত্যার যে জঘণ্য দৃষ্টান্ত এই সরকার তুলে ধরেছেন, তাতে কোন চিন্তাশীল নাগরিকই ক্ষোভ প্রকাশ না করে পারেন না। বিরাট বিরাট ব্যানার আর পোষ্টার নিয়ে মধ্যবিত্ত মানুষরা তাই প্রায়ই এখানে যুদ্ধ-বিরোধী শ্লোগান দিতে থাকে। এব্রাহাম লিঙ্কনের বিরাট প্রতিমূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে প্রতিকার চায়, স্ট্যাচু অব লিবার্টির কাছে অভিযোগ জানায়।

এখানে ছাত্র মাত্রই হিপি বাউণ্ডুলে নয়। বরং সুস্থির ও মেধাবী ছাত্রদের সংখ্যাই বেশী। তাদের কেউই ভিয়েতনামে যেতে রাজি

নয়, নিগ্রোদের অধিকার-হরণের পক্ষপাতিও তারা নয়। এরা চায় সুস্থ ও স্বাভাবিক সমাজ জীবন। কিন্তু পরিপূর্ণ ধনতান্ত্রিক দেশে সুস্থ ও সবল সামাজিক জীবন একেবারে অবাস্তব। মানসিক স্থৈর্য বজায় রাখা খুব কঠিন।

এত উন্মাদের সংখ্যা পৃথিবীতে আর কোন দেশে দেখা যায় কিনা সন্দেহ। মানুষের মনে এমন আত্মহত্যার প্রবণতা সচরাচর দেখা যায় না!

গভীর হতাশা, অবরুদ্ধ কান্না, উদ্দেশ্যহীন জীবন,—সত্যই এক বিরাট কবন্ধে পরিণত হতে চলেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

সেই কবন্ধের একটি রক্তচক্ষু,—এই কৃষ্ণ মুসলীমের দল!

এলিজা বলছেন: 'শ্বেতাঙ্গ-শাসনের আয়ু ফুরিয়ে এসেছে। ২০০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ধ্বসে পড়বে তাদের এত প্রতিপত্তি, এমন একচেটিয়া অধিকার। এটা হলো ইয়াকুবের জন্মের ঠিক ছয় হাজার বৎসর পরের ঘটনা। ইয়াকুবের জন্মের ঠিক দু' হাজার বছর পরে জন্মেছিলেন মোসেস: মোসেস আবির্ভূত হয়েছিলেন বর্বর ককেশিয়ানদের জ্ঞানচক্ষু খুলে দেবার জন্য। মোসেসের দু' হাজার বছর পর আবির্ভূত হয়েছিলেন যীশু; যীশু এসেছিলেন ইহুদিদের শিক্ষিত করবার জন্য।

এই তিন মহাপুরুষের জন্মের সময়গুলি অর্থাৎ, প্রায় ছয় হাজার বৎসর এই পৃথিবী শ্বেতাঙ্গদের দ্বারা শাসিত হয়ে আসছে। আগামী ২০০০ খ্রীষ্টাব্দে ওদের সেই শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটবে। নতুন জগতে সর্বময় ক্ষমতা আসবে কৃষ্ণ মুসলীমদের হাতে।' আল্লার এটা অমোঘ নির্দেশ!'

নিগ্রো দাসত্ব সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে এলিজা বলেন: 'জন হকিন্স এবং অন্যান্য দাস-ব্যবসায়ীরা ষোড়শ শতাব্দীতে আমাদের ছিনিয়ে আনে স্বদেশ থেকে। আমাদের নিয়ে শুরু হয় তাদের পাশব বেসাতি। এটা পরম শক্তিমান আল্লার অভিপ্রায়।

কারণ, এই দাস-ব্যবসায়ের মধ্য দিয়েই শ্বেতাঙ্গদের পতন শুরু। ওরা তখন কল্পনাও করতে পারেনি, এই সব কৃষ্ণাঙ্গ দাসেরাই একদিন সব কেড়ে নেবে তাদের হাত থেকে।'

এলিজা মহম্মদের এই সব উক্তি শুনে মনে হয়, কৃষ্ণ মুসলীম সমাজের আসল উদ্দেশ্য ধর্মনীতির চেয়ে রাজনীতিকেই বেশী প্রাধান্য দেওয়া। সাদাদের হাত থেকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কেড়ে নেবার স্বপ্নে তারা মশগুল। তবে ওদের কোন যুক্তিই খুব একটা বাস্তবসম্মত নয়; আর বাস্তবসম্মত নয় বলেই আল্লার নামে তাকে প্রচার করতে হয়।

এলিজা মহম্মদ কৃষ্ণ মুসলীমদের কাছে আল্লা প্রেরিত দূত। ওদের এই বিশ্বাসকে মহম্মদ দুই দিক দিয়ে কাজে লাগাচ্ছেন,—ধর্ম ও রাজনীতি। একটির সাথে অপরটি সংযুক্ত। ধর্মের কারণেই রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের পরিকল্পনা রয়েছে তাদের। কৃষ্ণাঙ্গদের হাতে ক্ষমতা আসবে, নতুন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠবে,—সবার উপরে রাজত্ব করবেন আল্লা-প্রেরিত দূত।

প্রতিটি কৃষ্ণ মুসলীমকে এই সত্য মেনে নিতে হয়। তারা বিশ্বাস করে, জগৎ তাদের দ্বারা শাসিত হবে। কিন্তু কি উপায়ে?

এ বিষয়ে কোন সঠিক উত্তর নেই। সেটা আল্লার কৃপা।

কৃষ্ণ মুসলীম সমাজের প্রতিটি সদস্যকে এলিজা আত্মসচেতন হতে বলেছেন। আগে নিজেকে জানতে হবে! সে জানবে নিজের ভাষা, ধর্ম, ঈশ্বর এবং সর্বোপরি তার জাতিকে। সে নিশ্চয় একজন যথার্থ মুসলীমের মতো সৎ জীবন যাপন করবে। সে অবশ্য তার শত্রুকেও চিনে রাখবে। এই শত্রু শুধু ব্যক্তিগত নয়, সে যেন জাতিরও শত্রু হয়!

'সাদাদের কাছ থেকে সরে এসো।'

এলিজা মহম্মদ ডাক দিলেন। হাজার হাজার নিগ্রোর

বুকের রক্ত উত্তাল হ'য়ে ওঠে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে তারা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলে মেনে নিতে পারছে না। কারণ, এখানে সাদা-কালোর দুস্তর ব্যবধান, একদল নির্বিবাদে অপর দলকে শোষণ করে চলেছে। এটা নিশ্চয় সুস্থ গণতন্ত্রের লক্ষ্য নয়। যে সব নিগ্রো ছেঁদো যুক্তিতে এই ব্যবস্থা মেনে নেয়, এলিজা মহম্মদের কাছে তারা নিছক আত্মপ্রবঞ্চক। নিজেদের ঐতিহ্য সম্পর্কে তারা সচেতন নয়, ভবিষ্যতের স্বপ্নও তারা দেখে না। এলিজার কাছে তারা করুণার পাত্র।

কোন নিগ্রো যখন এব্রাহাম লিঙ্কনের নামে শ্রদ্ধায় মাথা হেঁট করে, এলিজা মহম্মদের ভ্রূ কুঁচকে আসে। ঠোঁট বাঁকিয়ে তিনি তখন বলেন :

…আব্রাহাম লিঙ্কন আসলে আপনাদের বন্ধু নন। তিনি আপনাদের প্রকৃত মুক্তির কথা কখনো ভাবেননি। নিগ্রোদের জন্য পৃথক ও স্বাধীন রাষ্ট্রের কথা তিনি ভাবতেও পারতেন না।…ফেডারেল গভর্ণমেণ্ট আমাদের কী দিয়েছে? কী দিতে পেরেছে এই প্রায় বিশ লক্ষ কালো মানুষদের? চার শ' বছর ধরে আপনারা সাদাদের পদসেবা করে এসেছেন। আপনারা দাসত্ব-মুক্তির কী কথা বলছেন? যারা আপনাদের ঘৃণা করে, তারা কোন দিন আপনাদের স্বীকৃতি দিতে পারে না। আমেরিকার জন্য আপনারা রক্ত, অশ্রু ও ঘাম —একই সাথে বিসর্জন দিয়েছেন। এ দেশের হয়ে কত যুদ্ধ আপনাদের করতে হয়েছে! প্রতিবারই আপনাদের কামানের মুখে ঠেলে দিয়ে নিজেদের মসনদ নিরাপদ রেখেছে ককেশিয়ান জাতিরা। স্বদেশে, বিদেশে তথাকথিত নিগ্রোদের যত রক্তপাত ঘটেছে, তার লেখাজোখা নেই। অথচ, মার্কিন সরকারের কাছ থেকে কোন সুবিচার প্রত্যাশা করাটাও যেন বাতুলতা! উপরন্তু পরোক্ষ ভাবে এই সরকার গুণ্ডাদের লেলিয়ে দিচ্ছে আপনাদের বিরুদ্ধে। আপনাদের মা, স্ত্রী এবং মেয়েরা অত্যাচারিত হচ্ছে তাদের দ্বারা।

কালো মেয়েদের উপর পাশবিক অত্যাচার চালিয়ে উল্লাসে স্ফীত হয়ে ওঠে সাদা যুবকরা। এর কত ভূরি ভূরি প্রমাণ রয়েছে আমার হাতে।

যখনই রাষ্ট্রের কাছে আপনি এর প্রতিকার চাইবেন, শুনতে পাবেন তীক্ষ্ণ বক্রোক্তি : 'এটাই তোমাদের প্রাপ্য, নিগারের দল !'

'That's good for you, nigger···'

বলতে বলতে নিজেই উত্তেজিত হয়ে পড়লেন এলিজা মহম্মদ। তাঁর হাত দুটো মুষ্টিবদ্ধ, নাশা কাঁপছে থর থর করে। আগুনের হলকা বের হয় নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে। সেই উত্তাপ সঞ্চারিত হয় তাঁর অগণিত শিষ্যদের মধ্যে। প্রচণ্ড সিংহ-চিৎকারে তারা জানিয়ে দেয় :

আমরা মানি না! আমরা মানি না তোমাদের রাষ্ট্র, এ সমাজ, শান্তির নামে এত সব বুজরুকি! আমরা মানি না শ্বেতাঙ্গদের, স্বীকার করি না তথাকথিত ভীরু নিগ্রোদেরও! আমরা মুর,—রক্তে মোদের জেহাদী উত্তাল!

আবেসিনিয়ার পাহাড়ী ঝড় আজ যেন সত্যিই আছড়ে পড়েছে আমেরিকার বুকে। আটলান্টিকের রিঁ রিঁ গর্জন ক্রমশই ধেয়ে আসছে ন্যুইয়র্কের দিকে। স্ট্যাচু অব লিবার্টিতে ফাটল ধরেছে। ফাটল ধরেছে আমেরিকার মাটিতে। ফুটিফাটা চৌচির সেই দেহ থেকে বের হচ্ছে বিষাক্ত লাভা,—জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে সব খাক করে দেবে!····

প্রফেসর বার্ণের লাল মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম : 'স্যার, কালো মুসলমানদের সম্পর্কে আপনার কী ধারণা ?'

বার্ণ চমকে উঠলেন। চোখ দুটো বুজে এলো তাঁর। চুরুটের বাদামী ধোঁয়ার কুণ্ডলীটা পাক খেতে থাকে তাঁর মুখের চার পাশে। বলিরেখাগুলি যেন আরো গম্ভীর হয়ে আসে। গম্ভীর স্বরে

তিনি বললেন: 'ওরা ইতিহাসের অনিবার্য ফসল। কালোদের উপর পৃথিবী জুড়ে সাদারা এতকাল যে ভাবে অত্যাচার করে এসেছে, তাতে এদের সৃষ্টি খুবই স্বাভাবিক। জানো তো, ইতিহাস কাউকেও ক্ষমা করে না। গায়ের চামড়া নিয়ে মানুষকে ঘৃণা করতে শেখায় যে সভ্যতা, তার চূড়ান্ত পতন অনিবার্য।'

বার্ণ বলছেন:

'কালো, পীত ও লালেরা সমবেত হচ্ছে সাদাদেব বিরুদ্ধে। ওবা বুঝে নিয়েছে, আক্রমণই হচ্ছে আত্মরক্ষার প্রধাম উপায়। এলিজা মহম্মদের ধর্মচিন্তা বাহ্য, আসল উদ্দেশ্য হলো অত্যাচারি সাদাদেব বিরুদ্ধে কালোদের একটি বিরাট সংগঠন গড়ে তোলা। সন্দেহ নেই, তিনি সফল হয়েছেন। কৃষ্ণ মুসলীমদের চটাতে আজ মার্কিন সরকারও ভয় পান। অথচ, সমানে সংবিধান-বিরোধী কাজ করে চলেছে তারা। আমেরিকার বুদ্ধিজীবীদের যুদ্ধ-বিরোধী শ্লোগানেব সাথে গলা মিলিয়ে এলিজা মহম্মদও বলছেন: 'আমার একজন শিষ্যও আমেরিকান গভর্ণমেণ্টের যুদ্ধবাজ নীতির সামিল হতে রাজি নয়। কোন কৃষ্ণ মুসলীম যুবক স্টেনগান হাতে ভিয়েতনামের জঙ্গলে ঘুরে বেড়াবে না। কোন পীত সৈনিকের রক্তপাত ঘটবে না আমাদের হাতে।....'

মার্কিন রণনীতির প্রতি এটা প্রচণ্ড আক্রমণ।

যদি ক্রমশ সমস্ত নিগ্রোরা এমন বেঁকে বসে, তবে তার নয়া সাম্রাজ্যবাদ রক্ষা করবে কারা? ভিয়েতনামে, কম্বোডিয়ায়, জাপান সমেত সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়, স্পেন, লাতিন আমেবিকার একাধিক অনুন্নত দেশে,—এদের দাবিয়ে রাখবে সে কি ভাবে? চিন্তার কথা। সিয়ার পাপ-চক্র বাইরে কাজ ভালোই করে চলেছে, কিন্তু ঘর সামলাবে কে? ঘর সামলানোটাই আজ বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে মার্কিন সরকারের কাছে।

এলিজা বলছেন, বর্তমান পৃথিবী অন্যায় ও শঠতায় পূর্ণ। এই অন্যায় ও অপরাধের যুগকে যত দ্রুত সম্ভব খতম করতে হবে। এরই জন্য কালো মুসলমানদের কতকগুলি বিশেষ নীতি মেনে চলা দরকার ঃ

এক নম্বর, সাদা লোকদের কাছ থেকে দূরত্ব বজায় রাখা।

দুই নম্বর, নিজেদের মধ্যে একটি পৃথক ও সুন্দর শাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলে নৈতিক শক্তি অর্জন করতে হবে।

তিন নম্বর, পরস্পরের সুখ ও সমৃদ্ধির জন্য সমবেত চেষ্টা করে যেতে হবে।

চার নম্বর, কালো মুসলমানদের পরিপূর্ণ ঐক্য চিরদিন বজায় রাখতে হবে।

সমগ্র বিশ্ব একদিন ইসলামের পতাকার নীচে সমবেত হবে,—কালো মুসলমানদের এটাই ধ্রুব বিশ্বাস। সেই পৃথিবী শাসিত হবে শুধু মাত্র কালোদের দ্বারা। সাদাদের কোন অবস্থান থাকবে না সেখানে।

কিন্তু যতদিন পর্যন্ত সে জগৎ গঠিত না হচ্ছে, ততদিন কালো মুসলীমদের জন্য একটি ছোট, কিন্তু শক্তিশালী রাষ্ট্রের প্রয়োজন। সেই রাষ্ট্র গড়ে উঠবে উত্তর আমেরিকায়, সাদাদের বিলকুল হটিয়ে দিয়ে ইসলামের পতাকা উড়িয়ে দিতে হবে। ক্রমশ আমেরিকাকে কেন্দ্র করে সেই অধিকার বিস্তারিত হবে পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও!

মস্ত পরিকল্পনা! অধিকাংশ যুক্তিনিষ্ঠ মানুষের কাছে মনে হবে, এ-সব প্রলাপ মাত্র! একেবারে অবাস্তব! কিন্তু কৃষ্ণ মুসলীমরা তা সমস্ত অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করে। আর সেই বিশ্বাসের জোরেই ওরা এত বেপরোয়া, মারমুখী।

এলিজা মহম্মদ এরই মধ্যে মার্কিন সরকারের উপর চাপ দিতে শুরু করেছেন: আমাদের পৃথক রাষ্ট্র দিতে হবে। সেই

রাষ্ট্রের প্রারম্ভিক অবস্থায় আপনাদের কিছু বস্তুগত সাহায্যও চাই।

মার্কিন সরকার এ সব কথায় কর্ণপাত করেন না। করা সম্ভবও নয়। কিন্তু এলিজা চূড়ান্ত মুহূর্তের অপেক্ষায় আছেন। তাঁর শিষ্য সংখ্যা আরো অনেক বৃদ্ধি পেলে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে নেমে পড়বেন। আমেরিকার শরীর কেটে একখণ্ড দেশ তাদের দিতে হবেই। ইহুদীরা ইস্রায়েল পেয়েছে। কালো 'মূরীশ' লোকদের জন্যও প্রয়োজন পৃথক এক রাষ্ট্র ব্যবস্থা।....

অল্প কিছুদিন আগের কথা। এক নিগ্রো সাংবাদিক গিয়েছিলেন এলিজা মহম্মদের ইণ্টারভিউ নিতে। তাঁর প্রশ্ন ছিল: 'কোথায় আপনি নিগ্রোদের জন্য পৃথক রাষ্ট্র গঠনে ইচ্ছুক?'

এলিজার চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল; বলেছিলেন: 'পৃথিবীর যে কোন একটি সমৃদ্ধশালী অংশে,—যেখানে থাকবে যথেষ্ট সংখ্যক ফ্যাক্টরি, ফার্ম, বাড়ী, চাকুরির সংস্থান ইত্যাদি।'

এলিজা মহম্মদ তাঁর শিষ্যদের বলছেন: আপনারা পরিশ্রম করুন। এই পরিশ্রমলব্ধ অর্থে ব্যবসা-বাণিজ্য করুন। এ দেশের অর্থনীতি নিজেদের হাতে নিয়ে আসুন। অহেতুক খরচকে প্রাধান্য না দিয়ে সঞ্চয় করুন।....মনে রাখবেন, অর্থনৈতিক মুক্তি না এলে রাজনৈতিক মুক্তি সহজে পাওয়া যায় না।

হয়তো এলিজারই এই নির্দেশে কালো মুসলমানরা আজকাল বেশ ডলার কামাচ্ছে। মার্কিন বাণিজ্য জগতে তাদের অনুপ্রবেশ ঘটছে। খরচ করে কম। সঞ্চয় করে বেশী। সেই সঞ্চিত অর্থে কৃষ্ণ মুসলীমদের মিলিত তহবিল ক্রমশই স্ফীত হয়ে উঠছে।...

প্রেসিডেণ্ট জনসনের বিদায়ের পর প্রেসিডেণ্ট নিক্সনের নির্বাচন-মুহূর্তে দেখেছি, সমস্ত আমেরিকা জুড়ে কী বিরাট উৎসাহ উদ্দীপনা!

অনেক রাত পর্যন্ত আলোচনার তরঙ্গ উঠেছে ক্লাবে, সভাতে, বাড়ীতে বাড়ীতে।

কিন্তু আমি এমন একজনও কৃষ্ণ মুসলীমকে দেখিনি, যে এসব নিয়ে ভাবছে। এলিজা মহম্মদ রাষ্ট্রপতি নির্বাচন সম্পর্কে কোন উচ্চবাচ্যই করেননি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক ঝটিকাপ্রবাহে তিনি নির্বিকার। কৃষ্ণ মুসলীমদের গায়ে আঁচড় না পড়লেই হলো।

কিন্তু রাজনীতি-বর্জিত কোন কাজই এ যুগে হতে পারে না। এলিজা ও এ সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন। কোন মন্তব্য না করে তিনি এখন পর্যবেক্ষণ করে যাচ্ছেন। নিগ্রোরা যত স্বাধীনতা পাবে, ততই তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে তিনি এগিয়ে যেতে পারবেন।

কোন রকম ভোটাভুটির প্রশ্নে কালো মুসলমানরা অংশ নেয় না; কারণ, মার্কিন সরকারের গণতন্ত্রে তাদের আস্থা নেই।

কিছুদিন আগে এলিজা মহম্মদ এখানে ঘোষণা করেছেন :

'...ইসলামের নামে' আমরা এক পৃথক ঐক্যবদ্ধ জাতি। যেদিন আমাদের পরিপূর্ণ ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হবে, সেদিন আমরা এক অপ্রতিহত শক্তিতে পরিণত হবো। এই শক্তির প্রচণ্ডতা শ্বেতাঙ্গদের সীমাবদ্ধ কল্পনাশক্তির অতীত। শ্বেত মুরুব্বীরা যে এ্যাটম বা হাইড্রোজেন নিয়ে এত বড়াই করে থাকে, তার চেয়ে অনেক গুণে শক্তিশালী হয়ে উঠবে আমাদের এই সংঘবদ্ধতা!....

'হে আমার স্বগোত্র ভাইরা, সমস্ত রকম ব্যক্তিগত বিশ্বাস-অবিশ্বাসকে ত্যাগ করে তোমরা এক ও অভিন্ন শক্তিতে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠো! তোমরা যেন একই দেহের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ,—একের ব্যথায় অপরে সমব্যথী! দেখবে এই একতাই তোমাদের সমস্ত সমস্যা ও দুঃখের অবসান ঘটাবে,—মুক্তি আসবে অসহনীয় দারিদ্র্যতা

থেকে, মুক্তি আসবে শ্বেতাঙ্গ-অপশাসন থেকে, মুক্তি আসবে গত চার শত বৎসরের শোষণ ও দাসত্ব থেকে।…'

সম্প্রতি এলিজার নীতিতে একটু যেন পরিবর্তনের ছোঁয়াচ লেগেছে। এতকাল তিনি শুধু নিম্নবিত্ত নিগ্রোদেরই ইসলামে দীক্ষিত হতে আহ্বান জানাতেন। ইদানীং মধ্যবিত্ত নিগ্রোদের কাছেও তিনি তাঁর প্রস্তাব রাখছেন। যদি এই সুশিক্ষিত নিগ্রোদেরও সমর্থন তিনি পেয়ে যান, কৃষ্ণ মুসলীমরা যে বিরাট শক্তিতে পরিণত হবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।'

সাড়া উঠেছে মধ্যবিত্ত নিগ্রোদের মধ্য থেকেও। ১৯৬০ সালে কৃষ্ণ মুসলীমদের বাৎসরিক সম্মেলনে বহু শিক্ষিত নিগ্রো আসন গ্রহণ করেছিলেন। এলিজা মহম্মদের প্রতি তাঁদের আকর্ষণ ক্রমেই বেড়ে চলেছে। সেই সভায় এলিজা বলেছিলেন :

'…আসুন, আমরা এক সাথে কাজ করি। আমরা আমাদের জাতিকে বিরাট করে তুলবো। আপনাদের সামাজিক প্রভাব দিয়ে আমাদের সংগ্রামকে আরো শক্তিশালী করে তুলুন। আমাকে তুলে ধরুন, সামগ্রিক ভাবে কালো মানুষদের মুক্তি অনিবার্য হয়ে উঠবে।…আমাদের সাথে হাত মেলাতে এখনো এমন দ্বিধা করছেন কেন? প্রকাশ্য সমর্থনে অসুবিধে থাকলে, শুধু নীরব নৈতিক সমর্থনে আমাদের আন্দোলনকে শক্তিশালী করে তুলুন! অন্ততঃ আর আগের মতো আমার গায়ে পাথরের টুকরো ছুঁড়ে মারবেন না। আমার সাথে দশ লক্ষ সংঘবদ্ধ নিগ্রো রয়েছে ; এদেরই সাহায্যে দু' কোটি নিগ্রোর মুক্তি আনবো আমি।….'

ব্যবসায়িক সূত্রে এলিজা মহম্মদ উচ্চ ও মধ্যবিত্ত নিগ্রোদের কাছাকাছি আনবার চেষ্টা করছেন। শিকাগোতে শুধুমাত্র কালো মানুষদের জন্য একটি বাজার খুলেছেন তিনি। সেখানে কালো

মুসলমান ছাড়া অন্যান্য ধর্মের নিগ্রোরাও বেচা-কেনা করতে আসে। পারস্পরিক ভাবের আদান-প্রদানের চেষ্টাতেই এলিজা মহম্মদ এটি খুলেছেন।

চোখ না রাঙিয়ে, ঘৃণা না দেখিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমগ্র নিগ্রো সমাজকে তিনি ইসলামের সুতোয় গেঁথে তুলবার চেষ্টায় আছেন।

একাধিক সংবাদপত্রের সাথেও এলিজা মহম্মদ যোগাযোগ বজায় রেখে চলেছেন। প্রচার ছাড়া উদ্দেশ্য সফল হতে পারে না—এলিজা এটা খুব ভালো ভাবেই জানেন। লস এনজেলসের জনপ্রিয় পত্রিকা Herald-Despatch কৃষ্ণ মুসলীমদের খবরাখবর ফলাও করে প্রকাশ করে। কৃষ্ণ মুসলীমরা নিজেরাই একটি মুখপত্র বের করেছে,—Courier.

গত চার বৎসরের মধ্যে এর বিক্রীর সংখ্যা অসম্ভব বেড়ে গেছে। চাহিদা বেড়েই চলেছে।....

কালো মুসলীমদের সংখ্যা, শক্তি ও জনপ্রিয়তা দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। কিন্তু ওদের এই শ্রীবৃদ্ধি বহুলাংশেই আঞ্চলিক। যে সমস্ত অঞ্চলে শ্বেতাঙ্গদের সংখ্যা কম এবং দুর্বল, সেখানেই এলিজা মহম্মদের সাফল্য। আইনের বেড়া ডিঙ্গিয়ে উত্তেজনাপূর্ণ আদর্শ প্রচারে এলিজা নিগ্রোদের 'ঘেটো' গুলিকে বেছে নিয়েছেন। সেখানে কৃষ্ণ মুসলীমদের কার্যকলাপ দেখলে আশঙ্কা হয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাঠামো সত্যিই বুঝি জরাজীর্ণ হয়ে পড়ছে। যে কোন দিন ধ্বসে পড়তে পারে।

তবু আশ্চর্য, ফেডারেল সরকারের সাথে এলিজা মহম্মদের এ পর্যন্ত তেমন কোন উল্লেখযোগ্য সংঘর্ষ বা বিবাদ দেখা যায়নি। একমাত্র সেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এলিজাকে দীর্ঘ তিন বছর হাজতে পুরে রাখা হয়েছিল। সন্দেহ করা হয়েছিল, কৃষ্ণ মুসলীমদের

প্রফেট বুঝি জাপানের স্পাই! 'আমেরিকান ইসলামের' পক্ষে সেটা ছিল অতি দুঃসময়। তারপর আবার মেঘ কেটে গেছে। সহাস্যে কারাপ্রাচীর থেকে বেরিয়ে এলেন এলিজা। স্ত্রী ক্লারার কপালে চুমু খেয়ে বললেন: আমাদের জয় হয়েছে। নৈতিক বিজয় হয়েছে আমাদের।....

মার্কিন সরকারের সহনশীলতা আছে। টেলিভিসন, খবরের কাগজ, সভা, প্রার্থনা-সভা,—সর্বত্র এলিজা মহম্মদ উত্তেজনা বাড়িয়ে চলেছেন। তবু কোন প্রত্যক্ষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে না তাঁর বিরুদ্ধে। এটা লক্ষনীয়।

আমি এ সম্পর্কে মার্কিন সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী বুঝতে চেষ্টা করেছিলাম। পরিষ্কার জানতে পারিনি। তবু ভাসা ভাসা ধারণা দিয়েছিলেন 'Outside America'-র সম্পাদিকা বোমন রুঁলো।

মিস্ রুঁলোর নাম শিকাগোর অভিজাত-অঞ্চল হাইড পার্কের অনেকেই জানেন। বছর ছত্রিশের এই বিদূষী ফরাসী মহিলাটি জন্ম সূত্রে আমেরিকান সিটিজেন। প্রায় দশ বছর আগে জার্নালিস্ট হিসেবে শিকাগোতে এসেছিলেন। আর ফিরে যাননি।

'Outside America' নামে একটি চমৎকার সংবাদ-সাপ্তাহিকের সম্পাদনা করেন। দেশ-বিদেশের রাজনীতি যেন তাঁর নখ দর্পণে। অনেক গোপন নথিপত্রেরও খবর রাখেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের 'Open reading room' এ আমি প্রথম মিস্ রুঁলোর নাম শুনতে পাই। অর্থনীতির অধ্যাপক প্রফেসর বেনস্, ইতিহাসের অধ্যাপক ভারতীয় ডঃ এস. সেনকে বলেছিলেন: 'হালফিল আমেরিকার খবর যদি চান তো, দেখা করুন গিয়ে Outside America-র সম্পাদিকা বোমন রুঁলোর সাথে। আপনাকে অনেক অকথিত তথ্যও দিয়ে দিতে পারেন। থাকেন সাঁইত্রিশ / বি, হাইড পার্ক এল. ফ্ল্যাটের চারতলায়।...

সেই থেকে রু'লোর সাথে দেখা করবার জন্য মনের মধ্যে তাগিদ অনুভব করেছি। কিন্তু সুযোগ করে উঠতে পারিনি। অথবা, সত্যের খাতিরে বলতে হয়, সাহসে কুলায়নি। নামী সাংবাদিকদের আমি একটু ভয় করি, তাতে তিনি যদি আবার অল্প বয়স্কা মহিলা হন।

সেদিন রবিবার।

সাধারণত এই একটি দিন আমি খুশী মতো পায়ে হেঁটে বেড়াই। ফুটপাথ ধরে এ মাথা থেকে সে মাথা শুধুই চক্কর লাগাই। কোথায় যাবো, কেন যাবো তা আগে থেকে কিছু ঠিক করি না। যে-দিক মুখ করে বের হই, সেদিকেই হাঁটতে হাঁটতে বাজার দেখি, হিপি জেনারেশনকে দেখি, দার্শনিককে দেখি, পার্কে বসে স্কেচ আঁকায় মগ্ন কোন শিল্পীকে দেখি।

সেদিনও এমনি দেখতে দেখতে হাইড পার্কের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। শিকাগোর এক মস্ত অভিজাত পাড়া এটি। নামী ও দামী লোকেরা বাস করেন। হাইড পার্কের ছোট্ট ময়দানে বিরাট লাল ফেস্টুন উড়ছে। ফেস্টুনটা পড়ে অবাক হলাম। আশ্চর্য! আমি তো কোন খবরই রাখি না। আজ রাতে এখানে পল রবসন গান গাইবেন। সেই আমার প্রায় স্বপ্নে দেখা নিগ্রো গানের যাদুকর পল রবসন। অনেক রাতে এঁরই রেকর্ড শুনতে শুনতে অন্য জগতে হারিয়ে গেছি! মনে হয়েছে কে যেন আলতো স্নেহের পরশ বুলিয়ে দিয়ে যাচ্ছে আমার ক্লান্ত দেহে ও মনে।

প্রবেশপত্র সংগ্রহের জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠলাম। দেখলাম, ফেস্টুনের নীচে ছোট ছোট অক্ষরে লেখা আছে: আসন সংখ্যা সীমিত! প্রতিটি প্রবেশ পত্রের মূল্য মাত্র দেড় ডলার। প্রবেশ পত্রের জন্য সত্বর যোগাযোগ করুন,—Outside America কার্যালয়, হাইড পার্ক।

মনের মধ্যে চকিতে মতলব খেলে যায়। এই তো সুযোগ! প্রবেশ পত্র সংগ্রহের সময় মিস্ রুঁলোর সাথে আলাপ করা যাবে। আমাকে বিদেশী দেখলে হয়তো খাতির করতে পারেন। আমিও ওঁর কাছ থেকে কৃষ্ণ মুসলীমদের সম্পর্কে অনেক অ-কথিত কাহিনী ও তথ্য জেনে যেতে পারি। এক ঢিলে দুই পাখী মারা যাবে।

সাহসে ভর করে এসে দাঁড়ালাম সেই মেঘ-চুম্বী বাড়িটার কাছে। আটত্রিশ তলা। এরই চার তলায় থাকেন মিস্ রুঁলো এবং ওটাই Outside America-র কার্যালয়।

লিফট অনবরত উঠছিল আর নামছিল। আমি একসময় টুক করে উঠে বসি। মাত্র দু' মিনিটের মধ্যে চারতলায় উঠে এলাম। অতি মসৃণ ফ্লোর। ফুলকাটা মোজাইক। মাঝে হাত পাঁচেক চওড়া দীর্ঘ লাল কার্পেট সোজা চলে গেছে Outside America-র কার্যালয়ে।

সরাসরি ওখানে না গিয়ে আগে একটা ল্যাভেটরিতে ঢুকে পড়ি। দেয়াল জোড়া আয়নায় দেখে নিলাম, আমাকে ঠিক স্মার্ট দেখাচ্ছে কিনা। খুশী হতে পারলাম না। কেমন যেন ভোঁতা ভোঁতা দেখাচ্ছে। নাকটা আমার বরাবরই চ্যাপ্টা, চুলগুলি অসম্ভব ঢেউ খেলানো, ঠোঁট বেশ লাল হলেও গায়ের রঙ প্রায় বাদামী। গলার টাইটা সুবিধের নয়, অনেকটা যেন যাত্রা-নায়কের মরচে ধরা তলোয়ারের মতো।

তবু ঠিক করলাম, এসেছি যখন দেখা না করে যাবো না। মিস রুঁলোর সাথে appointmentটা সারতেই হবে। দেশে ফিরে এসব স্মৃতিই হয়তো আনন্দের একমাত্র পাথেয় হয়ে থাকবে। বিশেষতঃ ফরাসী মেয়েদের প্রতি আমার একটু দুর্বলতা আছে। আমেরিকা আসবার আগে প্যারিসেও কাটিয়ে এসেছি একটি বৎসর। সেখানেও ঐ সরকারী বৃত্তি নিয়েই গিয়েছিলাম। পরিচয়

হয়েছিল একটি চমৎকার বিষণ্ণ ফরাসী তনয়ার সাথে, নাম যার তুঁলো রোকাতা।

যাক, আমি এগিয়ে চলেছি।

দীর্ঘ কার্পেট-পথ অতিক্রম করে এসে দাঁড়ালাম Outside America-র কার্যালয়ে। নিয়ন আলোর মোহময় পরিবেশে নাতিদীর্ঘ অফিসটি চমৎকার। মোটা সোটা এক নিগ্রো মহিলা একমনে কী যেন টাইপ করে চলেছেন। কিছু দূরে এক শুভ্রকেশ বৃদ্ধ কতকগুলি ফটো কাটিং পর পর সাজিয়ে যাচ্ছেন। দরজার সামনে এক নেপালী দারোয়ানকে দেখে আনন্দ হলো,—বিশ্বজুড়ে এমন বিশ্বাসী জাত বুঝি আর হয় না!

আমি যেতেই ওরা সচকিত হয়ে ওঠেন।

দারোয়ান উঠে দাঁড়ায়। নিগ্রো মহিলা তাঁর টাইপরাইটিং বন্ধ করে দেন। আর বৃদ্ধ ভদ্রলোকের কপালে জিজ্ঞাসা ফুটে ওঠে।

ঃ Whom do you want ?

দারোয়ানই প্রথম আমাকে জিজ্ঞাসা করে।

ঃ আমি মিস্ রুঁলোর সাক্ষাৎপ্রার্থী।

দারোয়ান স্মিত হাসলে। মহিলা আবার টাইপ শুরু করে দেন। বৃদ্ধ লোকটিও আগের মতো কাজে মন দিলেন।

ঃ স্লিপে আপনার নাম, ঠিকানা, পেশা ও উদ্দেশ্য লিখে দিন।

একখণ্ড কাগজ আমার দিকে এগিয়ে দিতে দিতে দারোয়ান বললো।

অফিসের বাইরে অনেকগুলি সোফা ও ডিভান পর পর সাজানো ছিল। আমি ওর একটাতে বসে পড়ি। যথাসাধ্য পরিষ্কার হাতের লেখায় লিখলাম ঃ

'নাম—শেখর সেনগুপ্ত,

জাতি—ভারতীয়,

ঠিকানা—বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রাবাস নং ৭ ;
উদ্দেশ্য—কৃষ্ণ মুসলীমদের সম্পর্কে কিছু তথ্য জানা।'

দারোয়ান আমার হাত থেকে স্লিপটা নিয়ে পাশের ঘরে ঢুকে গেল। সে ঘরের দরজাটা ভেতর থেকে ভেজানো ছিল। একটু পরেই ফিরে এলো সে। গম্ভীর ভাবে বললো ঃ

You will have to wait here for about ten minutes.

নিশ্চিন্ত দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করি! দশ মিনিট কেন, দশ ঘণ্টা অপেক্ষা করতেও আমি রাজি আছি। অবশ্য বুকের মধ্যেও অশ্বখুরের তাল ঠুকে চলেছে যেন কে! ভয় হয়, সম্পাদিকা মহাশয়া কেমন মেজাজের হবেন কে জানে! হয়তো সহজে পাত্তা দিতে চাইবেন না!....

দশ মিনিট দশ বৎসরের দীর্ঘ সূত্রতা নিয়ে বিদায় নিলো।... কলিং বেল বেজে ওঠে। সাথে সাথে সপ্রতিভ দারোয়ান নির্দেশ দিলো আমাকে ঃ যান! এখন দেখা করে আসুন!..

মিস্ রুঁলোর সাথে সেই প্রথম পরিচয়। দেখেই মুগ্ধ হয়েছিলাম। প্যারিসের সংযত মেয়ে তুলোর সাথে যেন সাদৃশ্য আছে। ছিপছিপে দীর্ঘাঙ্গি, সোনালী চুল, নীল চোখের তারা, সব সময় যেন হাসছেন। খাপ খোলা দামাস্কাস তলোয়ারের মতো বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা। বয়সের বিবর্তনকে এতটুকু ছাপ রাখতে দেননি তার মেদশূন্য দেহে। আমার সমস্ত আশঙ্কাকে উড়িয়ে দিয়ে হেসে উঠলেন মিস্ রুঁলো ঃ Be seated, please...খুব সুখী হলাম আপনার ঔৎসুক্য দেখে। কিন্তু ব্যাপার কি জানেন, কৃষ্ণ মুসলীমদের সম্পর্কে সমস্ত তথ্য আমারও জানা নেই। তবু বলুন, যতটা জানি নিশ্চয়ই বলবো।

মিস্ রুঁলো একটা সিগারেট ধরালেন। আর একটা অফার করলেন আমাকে। বেশ একটা অন্তরঙ্গ পরিবেশ অনুভব করতে পারি। ঘরে আর তৃতীয় প্রাণী নেই। মস্ত প্রশস্ত ঘর। কিন্তু একেবারে বাহুল্য বর্জিত। শুধু দেয়াল আলমারিগুলিতে পাহাড় প্রমাণ বই থরে থরে সাজানো, চক চকে মরক্কো চামড়া মোড়া খান কতক সোফা এবং এই একটা মস্ত টেবিল, যার এক পাশে বসে আছেন মিস্ রুঁলো এবং আর এক পাশটা চেপে ধরেছি আমি।

আমি সহজ সুরে বলতে শুরু করি: 'আমি শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় ছাত্র। রকফেলার স্কলারশিপ পেয়ে এখানে এসেছিলাম বস্তু বিজ্ঞানের উপর গবেষণা করতে। সম্প্রতি ডিগ্রি পেয়েছি। এবার ফেরার পালা।

কিন্তু আমার অন্য একটা পরিচয় আছে; অথবা, বলতে পারেন আমার অন্য একটা জগৎ আছে। বাংলা দেশের এক বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার সাথে সাথে একটি ছোট খাটো সাহিত্যপত্রও সম্পাদনা করতাম। খান কতক গবেষণামূলক সাহিত্য-গ্রন্থও রচনা করেছি। আমেরিকা ঘুরে গিয়ে এ দেশ সম্পর্কে কিছু না লিখে পারবো না।

সেই বহু বছর আগে ভূ-পর্যটক রামনাথ শিকদার এ দেশে এসে লিখেছিলেন 'হলিউডের আত্মকথা'। তারপর কত বই লেখা হয়েছে আমেরিকার উপর! আমি আর নতুন কী লিখবো?…

হঠাৎ আমার সাথে পরিচয় হয় একটি গরীব নিগ্রো যুবকের, নাম তার মাইকেল ভ্যালেনটাইন। ভ্যালেনটাইনের সাথে মিশে ইচ্ছে হয়েছিল, নিগ্রো সমাজের উপর একখানা উপন্যাস লিখবো। কিন্তু হঠাৎ একটা ঘটনায় আমার চিন্তাধারা অন্য খাতে বইতে শুরু করে!....'

এ পর্যন্ত বলে মুখ তুলে তাকালাম মিস্ রুঁলোর দিকে। দেখলাম, তিনি যথেষ্ট আগ্রহ নিয়েই আমার কথা শুনছেন।

আমি থেমে যেতেই হেসে বললেন, ঃ 'বলে যান, আমার বেশ ভালো লাগছে শুনতে।'

আবার স্মৃতির রেশ টেনে বলতে থাকি ঃ 'ঘটনাটা হলো এই যে, মাইকেল হঠাৎ ব্ল্যাক মুসলীম হয়ে গেল! এলিজা মহম্মদের ডাকে সাড়া দিয়ে ইসলামে দীক্ষিত হলো সে! সেই থেকে আমার মনে হয়েছে, কালো মুসলমানদের উপর একখানা তথ্য নির্ভর বই লিখবো। অনেক তথ্য সংগ্রহও করেছি। কিন্তু একটা জিনিস কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছি না। কালো মুসলমানরা আমেবিকায় একটির পর একটি সংবিধান বিরোধী কাজ করে চলেছে, কিন্তু ফেডারেল সরকার কী এ সম্পর্কে যথেষ্ট অবহিত নয়?'

লক্ষ্য করলাম, মিস্ রুঁলো এবাব গম্ভীর হয়ে উঠলেন। গালে হাত দিয়ে কিছুক্ষণ কী যেন ভাবলেন। তারপর বললেন ঃ 'মার্কিন সরকাব যে খবব রাখেন না, তা নয়। ববং, সমস্ত কিছুই তন্ন তন্ন করে খোঁজা আছে তার। আপনি নিশ্চয় স্বীকাব করবেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গুপ্তচর-বিভাগ যতখানি সক্রিয়, পৃথিবীব অন্য দেশে ততটা নয়। Federal Bureau of Investigation এর শ্যেণ দৃষ্টি আছে কালো মুসলমানদের প্রতিটি কার্যকলাপেব উপব। আসলে কৃষ্ণ মুসলীমরা মুখে যাই বলুক, প্রচণ্ড ক্ষমতাব অধিকারী এই সরকারকে আক্রমণ কববার মতো শক্তি তাদের মোটেই নেই। তার ধর্মভিত্তিক আন্দোলন কী এ যুগে বেশীদূর অগ্রসর হতে পারে? পারে না! ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থা মধ্যযুগেই সম্ভব ছিল, বর্তমানে ওসব 'থিওরী' অচল। ফেডারেল সরকার জানেন, একটা পর্যায় পর্যন্ত উঠবার পর এলিজা মহম্মদের স্বপ্নসৌধ ভেঙ্গে পড়বে! এ জিনিস কখনো স্থায়ী হতে পারে না! '

মিস রুঁলোব বক্তব্যকে অস্বীকার করতে পারলাম না। কথা প্রসঙ্গে তিনি বিশ্বরাজনীতির আরো অনেক বিচিত্র ঘটনার বর্ণনা দিলেন। বললেন, আরব-ইস্রায়েল সংঘর্ষের কথা। অল অক্‌শা

মসজিদের অগ্নিকাণ্ডের কথাও বললেন। তাঁর মতে, আরব রাষ্ট্রগুলি মধ্যযুগীয় ইমেজ কাটিয়ে উঠতে না পারলে ইস্রায়েলের হাতে বার বার এমন মার খেয়ে যাবে।....

মিস্ রুঁলোকে ভুলবো না। ভুলবো না ওঁর তীক্ষ্ণধী মন্তব্যগুলি, আর ভুলবো না তাঁর সৌজন্য। আমাকে পল রবসনের গান শুনবার জন্য গেষ্ট কার্ড দিলেন এবং বার বার বলে দিলেন আসবার জন্য।

নিজের আবাসে ফিরে গিয়ে ডায়েরির পাতায় লিপিবদ্ধ করলাম সব। আর মাত্র দিন পনেরো আছি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। পাসপোর্ট হয়ে গেছে। প্রবাসী জীবনের মেয়াদ ফুরিয়ে এলো। মনেব মধ্যে একটা বিষণ্ণ অনুভূতি। এখানে এসে খুব বেশী লোকের সাথে মেলামেশা কবিনি। নিজের লজ্জাকাতর স্বভাবের জন্যই তা সম্ভব হয়নি। কিন্তু যাদের সাথে মিশেছি, যাদের দেখেছি, তাদেব কাউকেই ভুলতে পারবো না। এরা প্রত্যেকেই আলাদা, একটা অন্তহীন সমুদ্রের মাঝে যেন কতকগুলি ভাসমান শিলা!

সন্ধ্যায় পল রবসনের সাঙ্গীতিক মূর্চ্ছনা আমাব সেই বেদনা বোধকে আরো বাড়িয়ে দিলো। পল রবসন নিজে নির্যাতিত নিগ্রো। জীবনে অনেক বেদনা তাঁর পুঞ্জীভূত হয়ে আছে। সেই বেদনাবিধুব চেতনাই যেন ঝরে ঝরে পড়ে তাঁর গুরুগম্ভীর সুর লহরিতে। ওহিয়োর এক বৃদ্ধ নাবিক পানামার বুকে দাঁড় বেয়ে বেয়ে এগিয়ে চলেছে। সে সমুদ্রে তার সবই দিয়েছে,—যৌবন, পারিবারিক শান্তি, জলমগ্ন যুবক সন্তান.,..। কিন্তু প্রতিদানে সে পেলো নিছক রিক্ততা ও শূণ্যতা। দাঁড়ের ছলাৎ ছলাৎ শব্দে সেই পরম শূন্যতা হাহাকার করে মরে।....

॥ সাত ॥

এমন আমি ভাবতেই পারিনি। ভাবতে পারিনি, মিস্ রুঁলো আমার মতো একজন নগণ্য ভারতীয় ছাত্রের আবাসে এসে উপস্থিত হবেন পরিচিতির ঘনিষ্ঠতা আরো বাড়িয়ে দিতে।

ঝকমকে শেভ্রোলেটে চেপে এসেছিলেন। বললেন ঃ খুব অবাক হয়ে গেলেন আমাকে দেখে ?

হেসে বললাম ঃ ভাবতেই পারিনি।

মিস্ রুঁলো বললেন ঃ আপনাকে আমন্ত্রণ জানাতে এসেছি। আজকের লাঞ্চটা আমার ওখানেই করবেন !

আমি বললাম ঃ অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু আপনাকে ছেড়ে দিতে ইচ্ছে করছে না। যদি আপনাদের অসুবিধে না হয়, আমি আপনাদের কার্যালয়ে যেতাম।

মিস রুঁলো হেসে উঠলেন ঃ সে তো খুব আনন্দের কথা। তবে আমার সঙ্গে একটু চলুন, শহরটা চক্কর খেয়ে আসি।

লোভনীয় প্রস্তাব। ঘুরতে পেলে আমি আর কিছু চাই না। শেভ্রোলেটের দরজা খুলে আসন নেই। ড্রাইভ করবার দায়িত্ব মিস রুঁলোর। চকচকে মসৃণ পথের উপর দিয়ে নিঃশব্দে গাড়ী ছুটে চলে।

সকালের শিকাগো রৌদ্রস্নাত। কচি কলাপাতার মতো রোদ। রাস্তার দু' পাশে চলমান জনসমুদ্র। বিজ্ঞাপন শোভিত ব্যস্ত শহর শিকাগো। খুব ভোরে এ জেগে ওঠে, আর ক্লান্ত হয়ে শয্যা নেয় একেবারে রাত গভীরে।

স্টিয়ারিংএ হাত রেখে সামনের দিকে তাকিয়ে মিস্ রুঁলো বলেন ঃ কালো মুসলীমদের সম্পর্কে আপনার জিজ্ঞাসা সেদিন আমাকে একটু

ভাবিয়ে তুলেছিল। আমাদের আগামী সংখ্যায় এর উপর সম্পাদকীয় লিখবো ভাবছি।

আমি কৌতুকের সাথে বললাম: তা হলে আমি একটা নতুন theme দিয়েছি বলতে পারেন।

আমার দিকে না তাকিয়েই মিস্ রুঁলো বলতে থাকেন: ঠিক তা নয়। কৃষ্ণ মুসলীমদের আক্রমণ করে ১৯৫৬ সালে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম। তার ফল হয়েছিল সাংঘাতিক। আমাকে শাসিয়ে অনেক চিঠি আসতে থাকে কৃষ্ণ মুসলীমদের কাছ থেকে। আমার প্রাণনাশেরও হুমকি দেওয়া হয়েছিল।

চমক লাগলো আমার: বলেন কি!

মিস্ রুঁলো বলতে থাকেন: ১৯৫৬ সালে কৃষ্ণ মুসলীমদের সাথে শিকাগোর শ্বেতাঙ্গদের ব্যাপক দাঙ্গার আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল। সে বৎসর এলিজা মহম্মদ প্রকাশ্য জনসভায় সরকার বিরোধী সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছড়াচ্ছিলেন। খৃষ্টধর্মের উপর আক্রমণ, এব্রাহাম লিংকনের নিন্দা, মার্কিন সরকারের কুৎসা,—সবই চলতে থাকে।.... আমি এর প্রতিবাদ জানিয়ে সম্পাদকীয় লিখলাম। মৌচাকে যেন ঢিল পড়লো। রক্তচক্ষু নিয়ে তেড়ে এলো অনেকে। আমাকে প্রাণের ভয় দেখিয়ে উড়ো চিঠি আসতে থাকে। অবশ্য আসলে আমার কিছুই হয়নি। স্থানীয় নিরাপত্তা বিভাগ আমার দায়িত্ব নিয়েছিলো।....যাই হোক, কৃষ্ণ মুসলীম প্রচার যখন তুঙ্গে উঠেছে, তখনই সংঘর্ষ বাধলো। সংঘর্ষ বাধলো আমার সম্পাদকীয় লিখবার ঠিক একটি বৎসর বাদে।

১৯৫৭ এর ৭ই জুলাই। কয়েক হাজার কালো মুসলমান এসে জমায়েত হলো আমার ফ্ল্যাটের নীচে সদর রাস্তায়। হাতে মস্ত মস্ত ফেস্টুন নিয়ে শ্লোগান দিচ্ছিলো তারা। ঠিক সেই সময় একদল শ্বেতাঙ্গও আসছিল রাস্তার উল্টো দিক ধরে পাল্টা শ্লোগান দিতে দিতে। কালো মুসলমানরা ওদের দেখতেই বন্য-ভালুকের মতো

তেড়ে আসে। শুরু হলো প্রচণ্ড হাতাহাতি। মুহূর্তে ফেস্টুনের লাঠিগুলি হাতিয়ারে পরিণত হয়। রক্তারক্তি কাণ্ড। চারতলায় দাঁড়িয়ে শক্তিশালী ক্যামেরায় ধরে রাখি সেই রক্তক্ষয়ী মুহূর্তগুলিকে। অবস্থা শোচনীয় বুঝতে পেরে থানায় রিং করলাম। কিছুক্ষণের মধ্যে ছুটে এলো পুলিশ বাহিনী। পুলিশ দেখে এলিজা মহম্মদের অনুচরের দল আরো বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। লাঠি, ইট, পাথর দিয়ে আক্রমণ করে পুলিশের গাড়ি। একটা ওয়ারলেস ভ্যানে আগুন ধরিয়ে দেয়, আগুন লাগে এক পোশাকের দোকানেও,—চোখ জুড়ানো কয়েকটি মূল্যবান ডামিকে আছড়ে আছড়ে ভাঙ্গা হয় পথের উপর। দমকল বাহিনী ছুটে এলো। পনেরো মিনিটের মধ্যে সমস্ত লণ্ড ভণ্ড হয়ে গেল। পুলিশ সুপার নিজে আহত হলেন, একজন পুলিশ সার্জেণ্ট মারা গেলেন হাসপাতালে নেবার পর। কৃষ্ণ মুসলীমদেরও অনেকে আহত হলো। গোটা রাস্তাটায় চাপ চাপ রক্ত আর ক্ষত চিহ্ন। আমার আঙ্গুল ক্যামেরার শাটারে শুধুই ক্লিক ক্লিক শব্দ করে চলেছে। অত প্রত্যক্ষ ছবি আর কোন কাগজ সেবার দিতে পারেনি।'

মিস্ রুঁলো থামলেন।

থেমে গেল তাঁর গাড়িও।

'শিকাগো কফি হাউস' এর সামনে পৌঁছে গেছি আমরা। শহরের দক্ষিণ প্রান্তে এটি এক সম্ভ্রান্ত কফি-স্টল।

রুঁলো হেসে বললেন : চলুন, ভেতরে একটু কফি খাওয়া যাক।

কফি হাউসের দোতলায় একটি নিভৃত কেবিনে দু' জনে বসে পড়ি। আমার ঘর্মাক্ত মুখের দিকে তাকিয়ে মিস্ রুঁলো স্মিত হাসলেন। বললেন : আপনি কী একটু অস্বস্তি বোধ করছেন?

অবাক হয়ে বললাম : কৈ, না তো।

রুঁলো হেসেই বলেন : ভারতীয়রা প্রায়ই সলজ্জ স্বভাবের হন।

আমি প্রসঙ্গ পাল্টাবার প্রয়াস পাই ঃ আপনি শিকাগোতে একা থাকেন ; বাবা-মা কোথায় আছেন ?

রুঁলোর হাসি মিলিয়ে যায় ঃ আমার মা নেই। এক দাদা চাকুরি করেন প্যারিস বেতার কেন্দ্রে। আর বাবা ভ্রাম্যমাণ দুঃসাহসিক লোক। আমি জন্মাবার বছর খানেক আগে ইয়েমেনে চলে যান একটি তৈল সন্ধানী কোম্পানীর হয়ে। ইয়েমেনেতেই তাঁকে প্রাণ হারাতে হয় একদল ইউরোপ-বিরোধী আরব যুবকের হাতে।··

বাবার প্রসঙ্গ উঠলেই অতীতে হারিয়ে যান মিস্ রুঁলো। মঁসিয়ে জিদ্‌ রুঁলোর বিচিত্র জীবন। বিচিত্র স্বভাব। পৃথিবীর ভৌগলিক পরিক্রমা শেষ করতে হাজির হয়েছিলেন ছোট্ট আরবীয় দেশ ইয়েমেনে। আর ফিরে আসেননি।

মিস্ রুঁলো আমাকে বলছিলেন মঁসিয়ে জিদ্‌ রুঁলোর সেই অভিজ্ঞতার কথা ঃ ইয়েমেনের অধিপতি ইমাম এহিয়ার সাথে দেখা করতে চেয়েছিলেন বাবা। সঙ্গে তাঁর একখানা পরিচয়পত্রও ছিল। পরিচয়পত্রখানা দিয়েছিলেন মার্কিন দূতাবাসের এক পদস্থ কর্মচারী, বাবার পর্যটনী স্বভাবে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন।

ইমাম এহিয়ার দেখা পাবার জন্য সানাতে গিয়েছিলেন জিদ্‌ রুঁলো। ইমাম এহিয়ার প্রকাণ্ড প্রাসাদ দেখে তাঁর মনে হলো, এ যেন মধ্যযুগীয় কোন ইউরোপীয়ান ফোর্ট-স্টেট। দুর্গের মধ্যেই শহর, প্রাত্যহিক চলমান জীবন যাত্রা।

প্রাসাদের চত্বরে ঢুকে জিদ্ অনুভব করলেন, তিনি এখানে কত নিঃসঙ্গ। বহু আরবীয় তাঁর দিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। সানা শহরটি কম বড় নয়,—তখন এর লোকসংখ্যা ছিল প্রায় ষাট হাজার। শহরের মাঝখানে ইমামের প্রাসাদ ; প্রকাণ্ড—খাঁটি স্মারাসেবী স্থাপত্য-শিল্পের নিদর্শন। খড়খড়ি দেওয়া বড় বড় জানালা, সুদৃশ্য তোরণ।

জিদ্ রুঁলো কোন আরবীয়র কাছ থেকেই সহযোগিতা পেলেন

না। ইউরোপীয়ানদের চরিত্র সম্পর্কে তাদের মনে চাপা সন্দেহ ও অসন্তোষ। এরা এ দেশের ভূমি গ্রাসের জন্য এসেছে,—এমনই একটা ধারণা বদ্ধমূল হয়ে আছে। বিশেষতঃ যে সমস্ত বিদেশী প্রাসাদে ঢুকে ইমাম এহিয়ার সাথে দেখা করে, তাদের সম্পর্কে এদের সন্দেহ আরো দৃঢ়,—এহিয়াকে চাপ দিয়ে নিশ্চয় কোন সুবিধা আদায় করতে এসেছে।

তাই ইমামের সাথে দেখা করাটাই জিদ্ কঁলোর কাল হলো। ইমাম এহিয়ার দরবার। দরজায় নীলবর্ণ ইউনিফর্ম পরে দু' জন প্রহরী দাঁড়িয়ে আছে। জিদের দিকে অপ্রসন্ন চোখ মেলে তাকালো তারা।···দরবার ঘর প্রায় ত্রিশ ফুট লম্বা এবং বিশ ফুট চওড়া,—সমস্ত ঘরটাই ঘন কালো রঙ দেওয়া। দেওয়ালে শোভা পাচ্ছে ইমামের ঢাল-তলোয়ার-বর্ম।

ইমাম এহিয়া তিন ফুট উঁচু একটি তাকিয়ায় ঠেঁসান দিয়ে বসে ছিলেন। দোহারা চেহারার সুপুরুষ। কালো চোখের মণিতে গভীরতা কম নয়।

জিদকে দেখেই ইমাম সহাস্যে তাঁকে পাশে ডেকে বসান। বললেন, 'আমি জানি, আপনি কেন এই দেশে এসেছেন। কিন্তু বেশীদিন এখানে থাকবেন না। রাজধানী সানা আপনার পক্ষে নিরাপদ নয়। সাদা চামড়ার লোকদের এখানে কেউ পছন্দ করে না।'

ইমাম ঠিকই বলেছিলেন।

কিন্তু জিদ্ তাঁর কথা মানেননি। সানা ছেড়ে যাবার নামও করলেন না। বরং দিনের পর দিন সেই শহরের প্রতিটি কেন্দ্রে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।···

হঠাৎ একদিন এক কবরখানার পাশে ঘন জঙ্গলে আবিষ্কৃত হলো তাঁর মৃতদেহ। তখনো শরীরে পচন ধরেনি। মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে পিস্তলের গুলিতে প্রাণ হারিয়েছেন। অনুসন্ধানে জানা

গেল, একদল আরবীয় যুবক জিদ্ রুঁলোকে ডেকে এনেছিলেন ঐ কবরখানার নিভৃত অঞ্চলে, সম্ভবতঃ ওরাই হত্যা করেছিল বাবাকে।...'

মিস্ রুঁলোর গলার স্বর ভারী হয়ে এসেছে।

বয় কফি দিয়ে গেছে। র কফি। চিনির পরিমাণও খুব কম। তবু ভালো লাগছিল ওতে বার বার চুমুক দিতে।...

কফি হাউস থেকে বেরিয়ে দু'জনে এলাম Outside America-র কার্যালয়ে। মিস্ রুঁলো পুরনো ফটো-ফাইল খুলে দেখালেন কৃষ্ণ মুসলীম ও শ্বেতাঙ্গদের দাঙ্গার সেই সমস্ত ছবিগুলি। নিখুঁত ফটোগ্রাফি।

নিষ্পলক দৃষ্টিতে দেখতে থাকি। তারপর এক সময় মুখ তুলে বলি: ফটোগ্রাফিতে এমন চমৎকার হাত আমি অনেকদিন দেখিনি।...সাংবাদিক হিসেবে একবার ভারতবর্ষ ঘুরে আসতে পারেন তো আপনি!

মিস্ রুঁলো হাসলেন। বললেন: আমার কাগজের তেমন পয়সা নেই মিস্টার সেনগুপ্ত; যা আয় হয়, তার অধিকাংশই ব্যয় হয়ে যায়। সামান্য কিছু সঞ্চয় রাখতে হয় কাগজটির ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য।...

লাঞ্চে বসে মিস্ রুঁলো বললেন: আপনার সাথে পরিচয় হবার জন্য ভগবানকে ধন্যবাদ। যদি সম্ভব হয়, Outside America-র জন্য কিছু করবেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন পরিস্থিতির উপর article পাঠাবেন; আমরা সানন্দে ছাপবো।

বললাম: নিশ্চয় পাঠাবো। সামান্য দু' দিনের পরিচয়েই যেন আত্মীয়তা গড়ে উঠেছে আমাদের মধ্যে।

মিস্ রুঁলো বললেন: হয়তো আমেরিকার বাহ্যিক জীবন দেখে অনেক খারাপ ধারণা নিয়ে ফিরে যাচ্ছেন। কিন্তু বিশ্বাস করুন,

এ দেশের অধিকাংশ বুদ্ধিজীবীরাই খুব যুক্তিনিষ্ঠ ও ন্যায়নিষ্ঠ। এঁরা প্রতিটি জিনিসকে যাচাই করে নেন, কোন বাজে মন্তব্য করে বসেন না।

আমি বললাম: ে শী উচ্চস্তরের মানুষদের সাথে মেলামেশা করা হয়ে ওঠেনি আমার পক্ষে। কিন্তু এক নিগ্রো পল্লীতে গিয়ে দেখেছি,—ওদের অবস্থা কী বীভৎস! আমাদের দেশের ঘিঞ্জী বস্তীগুলিও এর চেয়ে ঢের ভালো।

মিস্ রুঁলো মাথা নীচু করলেন। স্বীকার করলেন: অস্বীকার করতে পারছি না। ধনতন্ত্রের অভিশাপে ধুঁকছে আমেরিকা। এলিজা মহম্মদের প্রাধান্য তাই এখানে এত বেশী।.....

সেদিন দুপুরে মিস্ রুঁলো কৃষ্ণ মুসলীম আন্দোলন সম্পর্কে আরো কিছু নতুন তথ্য জানালেন আমাকে।

১৯৫৭ সালে আমেরিকার স্থানে স্থানে কৃষ্ণ মুসলীম ও শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে দাঙ্গার সূচনা হয়। তেমন অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি বজায় ছিল ১৯৫৮ সালেও। ১৯৫৯ সালে ইণ্ডিয়ানার পুলিশ বিভাগ আদেশ জারি করলো, কোন প্রকাশ্য ময়দানে বা রাস্তায় কৃষ্ণ মুসলীমরা সভা-সমিতি করতে পারবে না।

কৃষ্ণ মুসলীমরা এই আদেশের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠে: ন্যুইয়র্ক বা অন্য কোন সিটিতে তারা এমন কদর্য ব্যবহার পায়নি পুলিশের কাছ থেকে। ইণ্ডিয়ানা-এ্যাডমিনিষ্ট্রেশান মুর্দাবাদ।...

১৯৬০ সালে শিকাগো শহরে আর একবার গণ-প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছিলেন এলিজা মহম্মদ। ব্ল্যাক মুসলীমদের Convention বসবে শিকাগো শহরে সে বছর। হঠাৎ এই শহরের অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান বেঁকে বসলো, কালো মুসলমানদের সাথে কোন রকম সহযোগিতা তারা করবেন না। এমন কি Chicago Car

Advertising Company ঘোষণা করলো, কালো মুসলমানদের প্রোপাগাণ্ডার জন্য কোন গাড়ি তারা দেবে না।

এলিজা মহম্মদ কিন্তু দমে যাবার পাত্র নন। সম্মেলন বসবার বহু আগেই তিনি ঐ সমস্ত কোম্পানীর সাথে চুক্তিপত্র করে নিয়েছিলেন। এখন এদেব অসহযোগিতা দেখে আইনের সাহায্য নিলেন। দশ হাজাব ডলাব ক্ষতিপূরণ চেয়ে শিকাগো কোর্টে কেস আনলেন তিনি কোম্পানীগুলির বিরুদ্ধে।

কালো মুসলীমদের পক্ষ সমর্থনে ছিলেন এ্যাটর্ণি চাউন্সি এসকিক্। তিনি বললেন: এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলি শুধুমাত্র চুক্তিই ভাঙ্গেনি, এক বিরাট প্রস্তুতির অপমৃত্যু ঘটিয়েছে। আগামী ২রা ফেব্রুয়ারী ইসলামের প্রকাণ্ড সম্মেলন বসবে এই শহরে। অথচ, এই মুহূর্তে এরা চুক্তি ভেঙ্গে সমস্ত বানচাল করবার ষড়যন্ত্রে মেতেছে। মহামান্য আদালতের কাছে তাই সবিনয় প্রার্থনা, তিনি যেন যত দ্রুত সম্ভব ইনজাংসন [Injunction] জারি করে ওদের বাধ্য করেন চুক্তি অনুযায়ী কাজ করতে।

বিচারক নেমিয়ার কিন্তু রাজি হলেন না, কোম্পানীগুলির বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে। উপরন্তু তিনি কালো মুসলীমদের চরম দৃষ্টিভঙ্গীর নিন্দা করলেন।···

শিকাগোতে সম্মেলন হয়েছিল। কিন্তু প্রত্যাশিত পর্যায়ে পৌছতে পারেনি। এলিজা মহম্মদ বললেন: সবেমাত্র সংগ্রামের শুরু হলো। আজ আমরা যে যথেষ্ট শক্তিশালী, তার অন্যতম প্রমাণ শ্বেতাঙ্গ সরকারের এত বিরোধিতা!···

১৯৫১ সালের ৫ই মার্চ। লুসিয়ানার মনরো শহরে কৃষ্ণ মুসলীমদের এক রুদ্ধদ্বার বৈঠক বসেছিল স্থানীয় আল্লা টেম্পলে।

সভায় সভাপতিত্ব করছিলেন এলিজা মহম্মদের অন্যতম সহকর্মী ট্রয় এক্স। হঠাৎ একদল পুলিশ এসে ঘিরে ফেলে সেই মসজিদ। দরজা ঠেলে ঢুকে পড়ে ভিতরে। ব্যাটন চার্জ করে সমবেত কৃষ্ণ মুসলীমদের উপর। পুলিশের হাতে অপমানিত হলেন ট্রয় এক্স। তাঁর কালো জ্যাকেট টেনে হিঁচড়ে ছিঁড়ে ফেলা হয়। মারতে মারতে নিয়ে যাওয়া হয় হাজতে।

এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে বদলা নিতে চেয়েছিল লক্ষ লক্ষ কৃষ্ণ মুসলীম। কিন্তু হাত তুলে ওদের থামতে বললেন এলিজা মহম্মদ: সময় এখনো হয়নি। আরো শক্তি, আরো সাংগঠনিক দৃঢ়তার প্রয়োজন প্রত্যক্ষ সংগ্রামে নামতে হলে।

দাঁতে দাঁত চেপে আল্লা টেম্পলের সদস্যরা সেবার নিজেদের সংযত করে নিয়েছে।

ট্রয় এক্সকে প্রহারের বিরুদ্ধে আবার কোর্টে মামলা এনেছিলেন এলিজা মহম্মদ। কিন্তু এবারেও তিনি 'সুবিচার' পাননি। কালো মুসলমানদের সংবিধান-বিরোধী চরিত্রকে আক্রমণ করে তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন লুসিয়ানা আদালতের বিচারক।

মধ্যবিত্ত শিক্ষিত নিগ্রোরা এলিজাকে সাধারণতঃ কোন স্বীকৃতি দিতে রাজি নয়। এলিজার জাতিতত্ত্ব মেনে নেওয়া তাদের পক্ষে কঠিন। এলিজা বলেন, আমেরিকার কালো মানুষরা নাকি আসলে আফ্রিকান নয়, এশিয়াটিক। কিন্তু শিক্ষিত নিগ্রোরা কখনো এ তত্ত্ব মেনে নিতে পারে না। আফ্রিকা যে তাদের আদি বাসভূমি, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। বিখ্যাত নিগ্রো নেতা রিচার্ড টি. গ্রীণার এলিজার এই সমস্ত উদ্ভট তথ্যকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেছেন। তিনি বলেছেন, এলিজার উচিত আফ্রিকাকে স্মরণ রেখে তাঁর বক্তব্য পেশ করা।

মধ্যবিত্ত নিগ্রোদের এই সমস্ত আক্রমণকে অবশ্য এলিজা গায়ে মাখেননি। নিম্নতলার নিগ্রোরাই তার সবচেয়ে বড় সমর্থক। আর নিম্নবিত্ত নিগ্রোরা মধ্যবিত্ত নিগ্রোদের কাছ থেকে যেভাবে ঘৃণা ও উপেক্ষা পেয়ে এসেছে, তাতে নিগ্রো নেতাদের বড় বড় ভাববাদী কথায় তাদের আর আস্থা নেই।

সমস্ত সমস্যাটাই হলো ধনতান্ত্রিক দেশের অসাম্য থেকে। অসাম্য থেকেই ভয় এবং ভয় থেকেই মরিয়া ভাবের উৎপত্তি। এমন মরিয়া হয়ে ওঠা নিগ্রোরাই তো এলিজাকে মাথায় তুলে রেখেছে। তাদের কাছে এলিজা সাক্ষাৎ ভগবান। আল্লা! এলিজা নিজে এটা খুব ভালোভাবেই জানেন। উচ্চবিত্ত নিগ্রোদের মানসিকতাকে আক্রমণ করে তিনি তাই বললেন ঃ

নিগ্রোদের মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পর্কটা কি রকম? তথাকথিত 'নিগ্রো নেতারা' তাদের সমাজের সাথে কতটুকু সম্পর্ক রাখেন? এদের পারস্পরিক সম্পর্ক অত্যন্ত শোচনীয়! একজন উচ্চবিত্ত নিগ্রো কখনো নীচের দিকে তাকায় না, পিছনের দিকে তাকায় না, সে শুধু জানে নিজেকে। আত্মসুখসর্বস্ব মানুষ সে। সে চায় একজন শ্বেতাঙ্গ মানুষ হতে। সে চায় শ্বেতাঙ্গ সমাজের কাছ থেকে বাহবা পেতে, নিজের আসল পরিচয় ভুলে গেছে সে। অথচ মজা হলো, সে এখনো সেই Black Belt এর মধ্যেই বাস করছে। কারণ সাদারা তাকে ওখান থেকে তুলে আনতে কোনদিনই রাজি হবে না।

The Negroes' relationship with one another is utterly deplorable···He wants to intergrate with the white man, but he cannot intergrate with himself or with his own kind···He still lives in the Black Belt because the white man says he cannot move····

কালো ঘেটো অঞ্চলে 'ধর্ম যুদ্ধের' পায়তারা কষে চলেছে কৃষ্ণ মুসলীমরা। নিম্নবিত্ত নির্যাতিত নিগ্রো পরিবারের সন্তান তারা। জীবনটা শুধুই ছিল ক্লেদাক্ত অভিজ্ঞতায় ভরা। অভাবের তাড়নায় কোন আদর্শ এতকাল খুঁজে পায়নি। সাদারা অত্যাচার করেছে, মধ্যবিত্ত নিগ্রোরা ঘৃণা করেছে। আজ ওরা তাদের নেতার সন্ধান পেয়েছে, পেয়েছে এক আদর্শের দ্যুতি। আব নিজেদের নিগ্রো মনে করে না তাবা। পেশল হাত উপবেব দিকে তুলে, বুক ফুলিয়ে বলে: আমবা মূবদের বংশধব। আল্লার কৃপায় এই দেশ আমরা জয় কববো। দূর করে দেবো অত্যাচারি ককেশিয়ানদের।

কিন্তু তিক্ত বিরোধ মাঝে মাঝে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে কৃষ্ণ মুসলীমদেব মধ্যেই। কিছু কিছু বিদেশী মুসলমান এসে ঢুকে পড়ে ওদেব সমাজে। ওবা কিছুদিনের মধ্যেই প্রতিবাদ জানাতে থাকে এলিজা মহম্মদের ঐশ্লামিক ব্যাখ্যার। তাবা বললো: ইসলামের নামে এলিজা মহম্মদ যা বলে থাকেন, তা ইসলামের সম্পূর্ণ পরিপন্থী! কোরাণেব অনুশাসন না মেনে খুশী মতো ধর্মীয় ব্যাখ্যা করে চলেছেন এই কৃষ্ণ মুসলীম নেতা। ইসলামের নামে ভাঁওতা দেওয়া চলবে না।

এলিজা মহম্মদ সম্প্রতি খুব বিব্রত বোধ কবছেন এই সমস্ত বিদেশী মুসলমানদের অপ্রত্যাশিত আক্রমণে। এলিজা-বিরোধী মুসলমানরা শক্ত ঘাঁটি গেড়েছে এই শিকাগো শহরেই। ছোট্ট একটি মসজিদও বানিয়েছে। তাদের দু'জন নেতা,—একজন জাতিতে জার্মান—মিঃ কুনজী এবং অপরজন পাকিস্থানী—হজরত মিরজা বসিরুদ্দিন। এদের এক প্রোবক্তা নূর-অল-ইসলামকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল: এলিজা মহম্মদের বিরোধী কেন আপনারা?

এর জবাবে নূর-অল-ইসলাম বললেন: 'এলিজা নিজেই নিজেকে আল্লা প্রেরীত দূত বলে পরিচয় দেন। ওঁর মুখ্য উদ্দেশ্য

ধর্ম নয়; নিছক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সুবিধা আদায় করে নেওয়া। ধর্মের নামে নিগ্রোদের লেলিয়ে দিয়ে ব্যক্তিগত সমৃদ্ধি ও স্বীকৃতি আদায় করে নিচ্ছেন তিনি।

আর আমরা যথার্থ অর্থে ইসলামের উপাসক। এলিজার মতো শিষ্যদেব আমরা অহঙ্কারী ও মারমুখী হতে বলি না। ইসলামে যে সততা ও সহনশীলতা আছে, এলিজা মহম্মদের শিক্ষায় তা নেই।..'

· আমেবিকাব মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে এলিজার আরো শত্রু রয়েছেন। ইদানীং ওয়েস্ট ইণ্ডিজজাত এক নিগ্রো মুসলমান এলিজাকে তীব্র ভাষায় সমালোচনা শুরু করে দিয়েছেন। নাম তাঁর আলহাজি তালিব আহম্মদ দায়ুদ। বয়স মাত্র সাঁইত্রিশ, সুস্বাস্থ্যের অধিকারী, চমৎকার কোঁকড়ানো চুল। ১৯৪০ সালে ইসলামে দীক্ষিত হন। ফিলাডেলফিয়াতে একটি মসজিদ তৈরী করান তিনি। মিস্টার দাউদ এলিজার এক নম্বর শত্রু। এলিজাকে আক্রমণ করবার প্রধান আয়ুধ হলো তাঁর সম্পাদিত New Crusader। এলিজার অনুগামীরা হাড়ে হাড়ে চটা এই কাগজটির উপর। New Crusader পয়সা দিয়ে কিনে তারা সাথে সাথে আগুনে পুড়িয়ে ফেলে।

এমন পারস্পরিক বিবাদ ও সংঘর্ষে মেতেছে মার্কিন দেশের কৃষ্ণ মুসলীম সমাজ। ওদের ভ্রাতৃবিরোধ যত বাড়বে, শ্বেতাঙ্গ সমাজ ততই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবে।

তবু একথা স্বীকার করতেই হবে, সমস্ত রকম বাধা-বিপত্তি প্রতিকূলতা অতিক্রম করে এলিজা মহম্মদ ক্রমশই এগিয়ে চলেছেন। তাঁর শক্তি ও জনপ্রিয়তাকে আজ আর কেউ উপেক্ষা করতে পারে না।

॥ আট ॥

'দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায় রইলো না··· ।'

নানা রঙের দিনগুলি এবার সোনার খাঁচা থেকে মুক্তি পেয়ে নিছক স্মৃতিতে পরিণত হতে চলেছে। প্যারিস ছেড়ে আসবার সময় ঠিক এমন এক লবণাক্ত অনুভূতিতে ভারাক্রান্ত ছিল আমার মন। এবার শিকাগো থেকে চলে আসবার সময়ও ঠিক সেই একই অনুভূতি বুকের মধ্যে অবরুদ্ধ কান্নায় গুমরে গুমরে উঠছে।

আর মাত্র তিন দিন। আর মাত্র তিন দিন পরে প্যান আমেরিকার অতিকায় যাত্রীবাহী জেটে চেপে সোজা ছুটে চলবো পালাম বিমান বন্দরের উদ্দেশ্যে। টেলিপ্রিণ্টারে ফ্ল্যাশ মেসেজ যাবে আমার প্রতীক্ষারত শুভাকাঙ্খীদের কাছেঃ Yes···I am coming after a long interval.

সময়ের ব্যবধান তো কম নয়।

প্রায় সাড়ে চার বছর। এই শহরের প্রতিটি ধমনী-সূত্রের সাথেও যেন আমার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা স্থাপিত হয়েছে। আজ বিদায়ের সময় সেই সম্পর্কের টান অনুভব করছি। যেন অনেকগুলো শিরা-উপশিরা টেনে ছিঁড়ে বেড়িয়ে যেতে হবে আমাকে।··

নিজেই নিজের মনকে নানা প্রশ্ন ও কৈফিয়ত তলব করি। আমেরিকা ঘুরে গিয়ে নিশ্চয় কলমের ডগা দিয়ে অনেক ফুলঝুরি ছড়াবো। কিন্তু তাতে বস্তুনিষ্ঠ সার্থকতা থাকবে কতটুকু? সত্যিই কী কৃষ্ণ মুসলীমদের উপর একখানা তথ্য সমৃদ্ধ বই লিখতে পারবো? ভাষার ফেনায় আসল বস্তু হারিয়ে যাবে না তো? নিজের কলমের উপরই অনেক সময় বিশ্বাস রাখতে পারি না।···

গতকাল এই শহরে প্রচণ্ড যুদ্ধ-বিরোধী বিক্ষোভ হয়ে গেছে।

প্রায় দশ হাজার শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গ নর-নারী ধিক্কার জানাচ্ছিলো মার্কিন সরকারের ভিয়েতনাম নীতির বিরুদ্ধে।

ছু' ছুটো মহাযুদ্ধেও মার্কিন যুবশক্তির এমন বিপুল অপচয় হয়নি। মার্কিন ডলারেও কখনো এমন কাঁপুনি লাগেনি। সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির অতি তৎপরতায় এশিয়ার অন্য কোথাও নতুন ফ্রন্ট না খুলতে পারলে, আর এদেশের সম্মান রাখা যাবে না। ইন্দোনেশিয়ায়, কম্বোডিয়ায়, মধ্যপ্রাচ্যে তাই সমানে ফাঁক খুঁজে চলেছেন মার্কিন সরকার। সুযোগ পেলেই আঞ্চলিক লড়াইয়ে মদত দিয়ে যাবেন নিজের পক্ষকে। কোটি কোটি ডলার মূল্যের উৎপাদিত অস্ত্রশস্ত্রের একটা চালু বাজার চাইতো! এই সমস্ত আঞ্চলিক উত্তেজনা সেই বাজারের বিস্তৃতি ঘটাবে। মার্কিন অস্ত্র ব্যবসায়ীদের এখন তুঙ্গে বৃহস্পতি। মধ্য প্রাচ্যে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়, ভারত-পাকিস্তান উপমহাদেশে সমরাস্ত্রের দারুণ চাহিদা করে রেখেছে। অনেক সময় সরাসরি অস্ত্র না দিয়ে কোন কোন এজেন্সির মারফৎ সেই কাজটুকু করা চলে। যেমন দক্ষিণ আফ্রিকা বা রোডেশিয়াকে সাহায্য পৌঁছে দেবার একচেটিয়া এজেন্সি নিয়েছে পর্তুগাল; পাকিস্তানকে মার্কিন সমর উপকরণ পৌঁছে দেবার এজেন্সি নিয়েছে তুরস্ক, ইরান ইত্যাদি দেশ! ঢালাও কারবার চলেছে। চলেছে অস্ত্রে অস্ত্রে ঠোকাঠুকি। আমেরিকা এক পক্ষকে দিলে রাশিয়া দেবে অপর পক্ষকে। এর কাছ থেকে মিগ এলে, ওর কাছ থেকে আসবে স্যাভার জেট। এ মিসাইল দিলে, ও দেবে গ্রাউণ্ড টু গ্রাউণ্ড মিসাইল। ছু'জনেরই বাজার বেশ তেজী। সমূহ মন্দা পড়বে বলে মনে হয় না। কারণ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে কোন উত্তেজনা একবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারলে, এই যুগে তা আর কখনো শান্ত হবে না। পৃথিবীর ছুটো শিবিরই তাকে শান্ত হতে দেবে না। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কোন রাজনৈতিক সমস্যার এ পর্যন্ত যথার্থ সমাধান করতে পেরেছে? কোরিয়ার আগুন

এখনো নেভেনি, তুই জার্মানীর কৃত্রিম বিচ্ছেদ আর একটা ভয়াবহ যুদ্ধের সম্ভাবনায় দিন গুণছে, কাশ্মীর নিয়ে ভারত-পাকিস্তান 'ডুয়েল ফাইট' চলছে এবং চলবে, আরব-ইস্রায়েল বিবাদ কখনো মিটবে বলে মনে হয় না, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া চিরদিনই অগ্নিগর্ভ, রোডেশিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র নিজেদের সংখ্যালঘু প্রভুত্ব দিব্যি বজায় রেখেছে···কোন সমস্যার সমাধান হয়েছে? অথচ, শান্তির ললিতবাণী সর্বত্রই শোনা যায়। প্রত্যেকেই শান্তির পূজারী। পিঠে এ্যাটম ও হাইড্রোজেন বেঁধে তারা শান্তির পায়রা ওড়াচ্ছেন,—কাফি খাঁর একটি ব্যাঙ্গচিত্রের কথা মনে পড়ে গেল।··

সেই বিক্ষুব্ধ জনসমুদ্রকে দেখে আমার মনে হয়েছিল, পৃথিবীর সব দেশেরই সাধারণ মানুষের চরিত্র প্রায় একই। কিন্তু কেন জানি না, এদের সম্মিলিত চিন্তাধারা যথার্থ প্রতিফলিত হয় না তাদের সরকারের মধ্য দিয়ে। রাষ্ট্রযন্ত্র যারা চালায়, তারা কী অন্য ধাতুর গড়া মানুষ? তারা কী সবাই বিচ্ছিন্নতাব অসুখে ভুগছেন? হয়তো তাই।····

শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় যেন সর্বজাতির এক মিলন মঞ্চ। পৃথিবীর প্রায় সব দেশের ছাত্ররাই এখানে এসে জমায়েত হয়েছেন। বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হয়ে ফিরে যান, স্বদেশের গৌরব বৃদ্ধি করেন।

জানি না, এতে সি. আই. এ.র গন্ধ আছে কিনা। তবে আমার মনে কিন্তু সে রকম কোন ছাপ পড়েনি।

ইতিহাস বিভাগে আলাপ হয়েছিল দক্ষিণ ভিয়েৎনামী যুবক ভিল কোয়াৎ-এর সাথে। সায়গনের আগন্তুক। মোটা বৃত্তি পান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে। হয়তো দেশে ফিরে

'পুতুল সরকারের' কাজে নিযুক্ত হবেন। ভিল কোয়াৎ কিন্তু স্বদেশের প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করতেই চান না। তবু ভিয়েতনামের বিপ্লবী সরকারের প্রধান ঙুয়েন ভান তিয়েনের নাম তুলতেই চমকে উঠেছিলেন ভিল কোয়াৎ। ওঁর হলদে মুখে রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি পেয়েছিল সেই মুহূর্তে। চশমাটা খুলে বারেকের জন্য থেমে চিবিয়ে চিবিয়ে উচ্চারণ করেছিলেন : Most dangerous fellow.

যার যেমন ভাষ্য!

মুক্তিকামী দুনিয়ার কাছে যিনি 'ম্যাৎসিনি,' সাম্রাজ্যবাদের দালালদের কাছে তিনিই Most dangerous fellow.

অধ্যাপক তিয়েনের জীবনী আমারও জানা আছে। লক্ষ লক্ষ জনতার তিনি প্রেরণাস্থল। বুদ্ধিজীবী মহল তাঁকে মাথায় করে রাখবেন। যুদ্ধ করেছেন ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে। মার্কিন সরকারের তাঁবেদার সায়গন সরকারের বিরুদ্ধেও আপোষহীন সংগ্রাম চালিয়ে এসেছেন এতদিন। ভিয়েতনাম নিয়ে অনেক বই লেখা হয়েছে, লেখা হয়েছে এ যুগের শ্রেষ্ঠ মানুষ হো-চি-মিনকে নিয়ে। এবার কিছু লেখা উচিত ঙুয়েন ভান তিয়েনেরও উপর। হ্যানয়ে বিপ্লবী সরকার গঠন করে জগৎকে সচকিত করে তুলেছেন। খোদ মার্কিন সরকারও আজ স্বীকার করতে বাধ্য, এই বিপ্লবী সরকার দক্ষিণ ভিয়েতনামের অধিকাংশই নিজেদের দখলে রেখেছেন!··

আমেরিকার প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রচুর সংখ্যক আফ্রিকান ছাত্রের দেখা মেলে। উগাণ্ডা, ট্যাঙ্গানিকা, নাইজেরিয়া,···ইত্যাদি সমস্ত দেশ থেকেই দলে দলে ছাত্ররা আসছেন মার্কিন শিক্ষাব্যবস্থার সাথে পরিচিত হবার জন্য। উগাণ্ডার ছাত্র সিমি বোথার সাথে আলাপ হয়েছিল। দেখলাম, বোথাও যথেষ্ট রাজনীতি-সচেতন। নিজের দেশ উগাণ্ডা সম্পর্কে তাঁর দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। এতটুকু

ভারসাম্য বজায় নেই তাঁর জন্মভূমিতে। যখন তখন ঝড়ের মাতন শুরু হয়। গণ্ডগোল লেগেই আছে। ডিসেম্বরের একেবারে শেষ সপ্তাহে বোথাকে দেখলাম, লাইব্রেরীর এককোণে দু' হাতে মুখ ঢেকে বসে আছেন। স্বদেশের খবরে খুবই বিচলিত তিনি। উগাণ্ডার জনপ্রিয় প্রেসিডেন্ট মিল্টন ওবোটের উপর গুলি বর্ষিত হয়েছে। আততায়ী অবশ্য তাঁকে প্রাণে মারতে পারেনি, কিন্তু জখম হয়েছেন প্রেসিডেন্ট মিল্টন ওবোট। সমগ্র উগাণ্ডায় জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে।

বোথা ফিস্ ফিস্ করে আমাকে বললেন: এটা দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রীয়াশীলদের কাণ্ড। প্রেসিডেন্টের সমাজতান্ত্রিক নীতি তাদের পছন্দ নয়।

আমার আর এক মুহূর্তও এই দেশে থাকতে ইচ্ছা করছে না।

বুঝতে পারি, বোথা এ ব্যাপারে মার্কিন চক্রান্তের গন্ধ পেয়েছেন।

আফ্রিকার ছোট ছোট দেশগুলিকে কিছুতেই সমাজতন্ত্রের দিকে পা বাড়াতে দেবে না আমেরিকা। চক্র ও চক্রান্তের বেড়াজালে চূড়ান্ত প্রতিক্রীয়াশীলদের জন্য পথ পরিষ্কার করে দিতে সে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।....

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির ছাত্র কদম রসুল সম্প্রতি এসেছেন এই বিশ্ববিদ্যালয়ে। এখানে এসেই আমাকে খুঁজে বের করেন। ওঁর আর এক ভাই ইমান রসুলের সাথে পরিচয় ছিল আমার। ইমানই কদমকে আমার কথা বলেছিলেন।

কদমের মুখে শুনলাম, অগ্নিগর্ভ পূর্ব পাকিস্তানের হাল হকিকৎ সংবাদ। মধ্যযুগীয় ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রের চূড়ান্ত দাপাদপি চলেছে সেখানে। ইতিহাসের ঘড়ি যেন উল্টোমুখে চলেছে পাকিস্তানে। মতলববাজ মানুষরা লাহোর, করাচি আর পিণ্ডিতে বসে কলকাঠি নাড়ছেন। নির্বিচার শোষণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে পূর্ব

পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক মানুষরা, বিশেষতঃ ছাত্ররা। পূর্ববঙ্গ পশ্চিম পাকিস্তানের নিছক এক উপনিবেশে পরিণত হয়েছে যেন। পূর্ব পাকিস্তানের চা ও পাটের বেসাতি করে পশ্চিম পাকিস্তান আজ ফুলে ফেঁপে একসার। আর বাঙালীর পাতে নুন-পান্তাও জুটছে না।

কিন্তু জমানা চিরদিন এক থাকে না। সংগ্রামী পূর্ববাংলা তাই আজ গর্জে উঠেছে। ধর্মের আফিং খেতে তারা আর রাজি নয়। বাংলা ভাষা ও ভাবের জন্য বুকের রক্ত ঢেলে দিয়েছেন ছাত্ররা।

পূর্ব বাংলার এমন তীব্র জাতীয় চেতনা দেখে পশ্চিম পাকিস্তানের ধনিক-বণিক মহলে দারুণ আতঙ্ক। সমগ্র পাকিস্তানেই কায়েমী স্বার্থের ভিত্তিমূলে দারুণ কম্পন শুরু হয়ে গেছে। সমস্ত রকম নোংরা কৌশলে সেই জাতীয় চেতনাকে হত্যা করতে চাইছেন পাকিস্তান সরকার।

কিন্তু পারছেন না। ধিকি ধিকি আগুন জ্বলছে সর্বত্র। সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের শপথ নিয়ে সংগ্রামে নেমেছেন পূর্ব বাংলার মেহনতী জনসাধারণ।

সম্প্রতি দাবী উঠেছে, পূর্ব বাংলাকে দুটো ভাগে ভাগ করা হোক। পূর্ব পাকিস্তানের কতকগুলি অঞ্চলে পরিকল্পিত ভাবে বাঙালী বিতাড়িত করে পশ্চিম পাকিস্তানীদের উপনিবেশ গড়ে তোলাই এই রাজনৈতিক প্রস্তাবের আসল উদ্দেশ্য। মুসলীম লীগের সুবিধাবাদী নেতা চৌধুরী খলিকুজ্জামানের প্রস্তাব এইটি। পূর্ব পাকিস্তানকে তিনি ভয় পান এবং আজ পর্যন্ত সেখানে একবারও যাননি। দূর থেকে বসে তিনি এর মৃত্যুবান নিক্ষেপ করতে চাইছেন। তাই প্রতিবাদে ফেটে পড়েছে সমগ্র পূর্ব বাংলা। ঢাকার 'অবজার্ভার' পত্রিকা লিখলো: 'এটা এক দুরভিসন্ধিমূলক প্রস্তাব। এর আসল উদ্দেশ্য হলো, পূর্ব বঙ্গের জনমতকে খর্ব করে প্রাদেশিক হানাহানি বৃদ্ধি করা।'

মওলানা ভাসানী এবং আতাউর রহমান খাঁ পরিস্কার জানিয়ে দিয়েছেন, পূর্ব পাকিস্তানকে বিভক্ত করবার কোন দুঃসাহস যেন পশ্চিম পাকিস্তান না দেখাতে আসে। চার কোটি বাঙালী বুকের রক্ত দিয়ে তাদের ভাষা, সংস্কৃতি এবং ভৌগলিক অখণ্ডতা বজায় রাখবে।...

শিকাগোতে বসে বিশ্ব রাজনীতির অনেক খবরই আমি এভাবে সংগ্রহ করতে পারতাম বিভিন্ন দেশের ছাত্রদের মুখ থেকে। খুব আগ্রহ নিয়ে শুনতাম। মনে মনে ভাবতাম। ভবিষ্যতের ছবি আঁকতাম। একদিকে হতাশার কালো ছায়া, অপরদিকে প্রত্যাশার উজ্জ্বলতা।....

এত সব ঘটবার আবর্তনে আমার মনে কিন্তু থেকে থেকে সেই একটি কথাই মনে পড়ে যায়ঃ আমেরিকার মুসলমান সমাজ কোন পথে চলছে?

এলিজা মহম্মদ কী সত্যই ইসলামের বাণী প্রচার করে চলেছেন? কোরাণের কতটুকু তত্ত্ব তিনি প্রতিষ্ঠিত করতে সম্ভব?

এসব সম্পর্কে প্রশ্ন উঠছে এবং সন্দেহ দেখা দিয়েছে। তাই বহু বিদেশী মুসলীম নেতা আজ বিদ্রূপ করছেন এলিজা মহম্মদকে। ইংল্যাণ্ডের সারেতে ওখানকার প্রবাসী মুসলমানরা এলিজাকে ইসলামের লোক বলেই স্বীকার করে না। তাদের কথায় 'Mr. Elijah Muhammad is Preaching nothing, but a caricature of Islam....'

এলিজা মহম্মদ প্রায়ই বলে থাকেন, মধ্যপ্রাচ্যের মুসলমান প্রধান রাষ্ট্রগুলি তাঁকে সমর্থন করে। মিশরের জনপ্রিয় নেতা নাসের তাঁর সমর্থক! কিন্তু এলিজার বিরোধী পক্ষ এ সব স্বীকার করেন না; তাঁদের মতে, এলিজা নিজের দুর্বলতা ঢাকরার জন্য খুব বেশী মিথ্যার আশ্রয় নিচ্ছেন। মধ্যপ্রাচ্যের কোন দেশই মার্কিন কৃষ্ণ মুসলীমদের

মদত দেয়নি। আর নাসেরের মতো মানুষ কখনো অমন উদ্ভট তত্ত্বকে মেনে নিতে পারেন না।

সবটা মিলিয়ে আমার মনে হয়েছে, এলিজা মহম্মদ ক্রমশই মরিয়া হয়ে উঠছেন। ফলে তাঁর গাম্ভীর্য ও রহস্যভরা প্রকাশভঙ্গী ধীরে ধীরে ভেঙ্গে পড়ছে। একজন ধূর্ত কূটনীতিজ্ঞ হিসাবেই এলিজা যেন চিহ্নিত হতে চলেছেন। এই 'ইমেজ' নষ্ট হয়ে গেলে সাধারণ নিগ্রোরা আর হয়তো তাঁর শিষ্যত্ব নেবার জন্য ছুটে যাবে না। এখনো পৃথিবীর অধিকাংশ নিগ্রো খৃষ্ট ধর্মে বিশ্বাসী। যীশুর নামে একদিকে যেমন তাদের মানসিক ও নৈতিক শান্তি, অপরদিকে তেমনি আন্তর্জাতিক সুবিধাও পাওয়া যায়। আজো মিশনারীদের কাছ থেকে বহু নিগ্রো পরিবার নানা ভাবে সাহায্য পেয়ে থাকে। ব্ল্যাক মুসলীমদের সে সক্ষমতা নেই।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিকাংশ নিগ্রোই আজ আর তাদের অতীত বাসভূমি আফ্রিকার কথা চিন্তা করে না। তারা চায়না নিজেদের এশিয়াটিক বলে পরিচয় দিতে। এমন কি, তারা চায়না কোন পৃথক নিগ্রো রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করতে। তারা চায় এই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই বাস করে ধীরে ধীরে গণতান্ত্রিক পন্থায় নিজেদের দাবী আদায় করে নিতে। এলিজা মহম্মদের নাটকীয় উত্থান, বিচিত্র তথ্য প্রচার এবং স্বাধীন নিগ্রোভূমির স্বপ্ন তাদের মনে দারুণ আলোড়ন আনলেও, সামগ্রিক ভাবে তারা এখনো বিদ্রোহী হয়ে ওঠেনি। ধর্ম ত্যাগের প্রবণতাও খুব বেশী দেখা যায়নি। অধিকাংশ নিগ্রোরাই প্রশ্ন করছে: এলিজা মহম্মদ কী ভাবে আমাদের এত সমস্যার সমাধান করবেন? ধর্ম চিন্তার চাইতে পেটের চিন্তাই আমাদের কাছে বড়। এলিজা মহম্মদ কিংবা শ্বেতাঙ্গ জনগণ কী আমাদের চাকুরি দেবেন? Is mr. Muhammad or white peaple giving us jobs?

....উত্তরের হিমেল বাতাস ঝাপটা মারে। অনেক দূরে যেন কোন মসজিদে আজান শুনতে পাচ্ছি। বিভিন্ন সুরের আজান। পরস্পর বিরোধী শব্দ লহরি ছুটে আসছে।

আমি ফিরে যাবো। শিক্ষাগুরু বৃহস্পতির আশীর্বাদধন্য ছাত্র কচের মতো। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, কোন দেবযানী আমার পথরোধ করে দাঁড়ায়নি!

সব মনে পড়ে যাচ্ছে। মনের পর্দায় উঁকি মারে মিকি,—মিসেস ব্লেকের নগ্ন দেহ দালাই মালাই করতে করতে হঠাৎ বিদ্রোহী হয়ে উঠছে! টেলিভিসনের পর্দায় প্রতিফলিত কৃষ্ণ মুসলীম নেতা এলিজা মহম্মদের ছবি মনে দাগ কেটে গেছে,—আগামী আমেরিকা কী এঁরই অঙ্গুলি হেলনে চালিত হবে? নাইট ক্লাবের অভিজ্ঞতাও ভোলা যায় না,—দঙ্গল দঙ্গল যুবক-যুবতীর সে কী উন্মাদ নৃত্য! মনে পড়ে মিকির বোন কেটির কথা—মাত্র ষাট সেণ্ট লাভ করবার জন্য রাতে ঘুম থেকে আমায় ঠেলে উঠিয়ে যে তার উলঙ্গ নাচ দেখিয়েছিল। জুলির কথাও ভুলবার নয়,—শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে বিশ্রী রোগ ছড়িয়ে দেবার জন্য যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী হয়েছিল। সর্বোপরি ভুলবো না, Outside America-র তীক্ষ্ণধী সম্পাদিকা মিস রুঁলোর কথা,—দেশে ফিরে গিয়েও তাঁর সাথে আমি যোগাযোগ রাখবো।...

সাঁ সাঁ ট্যাক্সি এগিয়ে চলেছে এরোড্রামের দিকে। উপরে নীল আকাশে একখণ্ড কালো মেঘ বাজপাখির ডানার মতো বেঁকে আছে। আজ কী ঝড় উঠবে? উঠলেও সে ঝড় আমি দেখতে পাবো না। কারণ ততক্ষণে শূন্যে ভেসে পড়বো আমি।...আমার ড্রাইভার একজন নিগ্রো। বলিষ্ঠ হাতে ষ্টিয়ারিং ধরে আছে। হঠাৎ ওর মাথায় ফেজ টুপি দেখে আমি চমকে উঠলাম। কৃষ্ণ মুসলীম নয়তো?

ঃ মাপ করবেন, আপনাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করছি, আপনি কি কৃষ্ণ মুসলীম ?—আমি সামান্য ইতস্তত করে জিজ্ঞাসা করলাম।

ড্রাইভার ঘুরে তাকায় আমার মুখের দিকে। সামান্য হেসে বলে ঃ আপনার অনুমান সত্য!

আর কোন প্রশ্ন করলাম না। কারণ জানতাম বিধর্মীদের কাছে নিজেদের সমাজ ও ধর্ম সম্পর্কে খুব বেশী বলতে রাজি নয় এরা। আর এলিজা মহম্মদের ধর্ম নীতি ঠিক স্পষ্টও নয়। রহস্যময়তা দিয়ে সবটাই ঢাকা। সেই রহস্যময়তা নিপীড়িত নিগ্রোদের টানে, আমার ম‌ে‌া বিদেশীকেও আকর্ষণ করে।

এই মুহূর্তে আমার মনে হলো, এলিজা মহম্মদের প্রয়োজন ছিল। শ্বেতাঙ্গদের এ যাবৎ বন্য অত্যাচারের জবাব দেবার জন্য মারমুখী কৃষ্ণ মুসলীম সমাজের উত্থান ঐতিহাসিক কারণে অনিবার্য। সমস্ত হতাশ অত্যাচারিত নিগ্রোরা তাদের 'ঘেটো' ত্যাগ করে ছুটে আসছে এলিজার কাছে। হাত তুলে জানিয়ে দিচ্ছে মনের সমস্ত গ্লানি ঃ

'আমরা মানি না তোমাদের দেশ, তোমাদের সরকার, তোমাদের সমাজ, তোমাদের সংবিধান! আমরা মানি না শ্বেতাঙ্গদের, মানি না তথাকথিত নিগ্রোদেরও। আমরা মূর,—রক্তে মোদের জেহাদী উত্তাল!...'

প্যান আমেরিকার বিরাট জেট বিমান নির্দিষ্ট সময়ে গর্জে উঠলো। সেই কানফাটা চিৎকারে গোটা বিমান স্টেশানটাই যেন কাঁপছে থর থরিয়ে। অতীত পৃথিবীর অতিকায় সরিসৃপের মতো একবার নড়ে চড়ে উঠলো, লাল চক্ষুগুলি দপ্ দপ্ করে জ্বলছে-নিভছে, আকাশের বুক চিরে সন্ধানী আলো অনেক দূর পৌছে গেছে।...বিমান এগিয়ে চলেছে। এখনো আমি মাটির বুকেই আছি। একটু পরেই শেষ হয়ে যাবে এই অনুভূতিটুকুও। মুহূর্তের মধ্যে শিকাগো আমার কাছে নিছক এক স্মৃতিতে পরিণত হবে। হয়তো দেশে ফিরে অন্য

এক পরিবেশে অনেক ভেবে ভেবে মনে করতে পারবো এই শহরের কথা : "ইয়া শহর, প্রকাণ্ড অজগরের চাকচিক্য নিয়ে রাস্তাগুলি হারিয়ে গেছে দৃষ্টির বাইরে, কচ্ছপ ঘাড় অমসৃণ ইট পাথরের বস্তুপিণ্ডগুলি শ্মশানচারী মৌনীবাবার ভেক ধরে আকাশ পানে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। কসাইখানায় জমা হয় মেদ-মাস-মজ্জা। ক্লারিওনেটের বিলাপ অশ্রুত নয়, সাদাদের তাচ্ছিল্য ও ভ্রূকুটির জবাবে স্পষ্ট প্রতিভাত হয় কালোদের প্রতিহিংসায় ধক্ করে জ্বলে ওঠা চোখগুলি !···

॥ নয় ॥

"In an age of decolonisation, it may be fruitful to regard the problem of the American Negro as a unique case of colonialism, an instance of internal imperialism, an underdeveloped people in our very midst.—I. F. Stone, The New York Review of Books.

কালোদের সমস্যা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনার অনেক অবকাশ আছে। কিন্তু আমার মতো একজন সাধারণ দর্শকের চোখেও ধরা পড়ে গেছে, মার্কিন দেশের গণতন্ত্রে কত বড় সাদা-কালো অসাম্য এই বিংশ শতাব্দীর শেষ লগ্নেও বর্তমান। এ সমস্যার সমাধান কোথায়? সমাধানের সূত্র কী রাষ্ট্রের হাতে? না, তা বেরিয়ে গেছে আইন ও শাসনযন্ত্রেরও বাইরে?

এই যুগকে ঐতিহাসিকরা চিহ্নিত করে থাকেন, সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে মুক্তির যুগ। কিন্তু বাহ্যিক সাম্রাজ্যবাদ আস্তে আস্তে লোপ পেলেও আভ্যন্তরীণ সাম্রাজ্যবাদ [Internal imperialism] অনেক দেশেই কণ্ঠরোধ করে আছে। কুবেরের দেশ আমেরিকায় এই আভ্যন্তরীণ সাম্রাজ্যবাদের দাপট দেখে এলাম। কালোদের উপর সবরকম চাপ দিয়ে সাদাদের প্রভুত্ব-রথ গড়গড়িয়ে এগিয়ে চলবে,—অষ্টাদশ শতকের সেই বাসনা আজও মুক্তি দেয়নি আমেরিকাকে। শত ঝড়-বৃষ্টির সংঘাতেও আমেরিকার এই জঞ্জালের স্তূপ ধুয়ে মুছে সাফ হবে কিনা, সন্দেহ। নিগ্রোদের 'ঘেটো-অভিশাপ' থেকে সহজে মুক্তি আসবে না, কারণ সামগ্রিক

ভাবে এ দেশের শাসন-যন্ত্র এবং সমাজ ব্যবস্থা এক শোষনতন্ত্রের উপর দাঁড়িয়ে আছে।

আর নিগ্রোরাও যদি এমন বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন আন্দোলনে নিজেদের ছড়িয়ে রাখে, তবে মুক্তি চিরদিনই দূরের বস্তু হয়ে থাকবে। কৃষ্ণ মুসলীম আন্দোলনের মতো পৃথক ও মধ্যযুগীয় আদর্শে সংগ্রাম শুরু করলে, নিগ্রো সমাজের অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে যাবে। সমগ্র সমাজের এক বিশেষ অংশকে নিয়ে পৃথিবী জয় করবার স্বপ্ন দেখাচ্ছেন এলিজা তাঁর শিষ্যদের,—এতে অনেক বিস্তৃত সংঘর্ষের সূচনা একদিন দেখা গেলেও নিগ্রো-সমাজের মুক্তি আসবে না।

বিরাট পরিবর্তনের প্রয়োজন। সমস্ত দিকের পরিবর্তন,—দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন, সামাজিক পরিবর্তন এবং রাষ্ট্রীয় পরিবর্তন! পরিবর্তনের প্রবণতাকে আসতে হবে প্রথমে কালোদের কাছ থেকেই। সাদারা কয়েক শতাব্দীর শোষণতান্ত্রিক বিশ্বাসে অভ্যস্ত; ওরা তাই চট করে উদার হতে চাইবে না। কালোদেরই সেটা করতে হবে। আমেরিকার গোটা নিগ্রো সমাজকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। সেখানে কোন জাতিগত, ধর্মগত বা ঐতিহ্যগত বিচ্ছিন্নতাবোধ থাকলে চলবে না।

কালোদের প্রথম উচিত, স্থানীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় বা বিদ্যালয়গুলিতে ক্রমশ নিজেদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একাধিক পাবলিক স্কুলগুলি অনেক দোষে দুষ্ট। অধ্যাপক মারলেন গীটেল ন্যূইয়র্কের পাবলিক স্কুলগুলির চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তাঁর "Participants and Participation" রচনায় বলেছেন:

Public education policy has become the province of professional bureaucrat, with the tragic result

that the Statusquo, suffering from many difficulties is the order of the day.

ঘেটোর স্কুলগুলিতে বেশী সংখ্যক নিগ্রো প্রিন্সিপাল ও শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে। স্কুল-কমিটিগুলিও গঠিত হবে কালোদের দ্বারা। নিগ্রো অভিভাবকদের এ বিষয়ে সচেতন হওয়া উচিত। সাদারাই যে দেশের সমস্ত শিক্ষাব্যবস্থা নিজেদের কব্জায় রেখে দেবে,—এমন সিদ্ধান্ত চিরদিন মেনে নেওয়া চলে না। অন্ততঃ শুধুমাত্র নিগ্রোদের জন্যই চিহ্নিত শিক্ষাকেন্দ্রগুলি যেন নিগ্রো শিক্ষকের দ্বারাই পরিচালিত হয়! সেই সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিগ্রো কিশোর দেখবে, সে একজন নিগ্রো শিক্ষকেব কাছেই পাঠ গ্রহণ করছে। এর ফলে নিজের জাতির উপর তার শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস অনেক বেড়ে যাবে; সেও নিজের সম্মান বৃদ্ধির প্রয়াসে ভবিষ্যতে আরো সচেষ্ট হয়ে উঠবে।...

নিজেদের অবস্থা উন্নত করবার জন্য নিগ্রোরা নিজেরাই বিশেষ কতগুলো পরিকল্পনা নিয়েছে। এতে হানাহানি, কাটাকাটির কোন সম্ভাবনা নেই; কিন্তু সাদাদের সাথে সরাসরি আলোচনার মাধ্যমে নিজেদের অবস্থা উন্নত করবাব উপায় রয়েছে। নিগ্রো বসতিতে বেসাতি করে সাদা বেণিয়ারা মোটা পয়সা কামায়। লক্ষ লক্ষ ডলার কামিয়ে তারা শহরাঞ্চলে নিজেদের বিত্ত বাড়িয়ে চলেছে। আজকাল নিগ্রোরা ওদের উপর চাপ দিতে শিখেছে; বলছে: 'বাপু, আমাদের মাথায় হাত বুলিয়ে শুধু নিজের পুঁজি বাড়ালেই চলবে না, আমাদের বস্তীগুলির দীনতা দূর করতে এবার থেকে ঐ পুঁজির কিছু ভাগ আমাদেরও দিতে হবে। যদি রাজি থাকো, তবে এখানে ব্যবসা ফেঁদে-মুনাফা পিটতে পারবে। আর রাজি না হলে, সরে পড়ো,—আমরা নতুন ব্যবসায়ীর জন্য জায়গা ছেড়ে দেবো!'

সাদা ব্যবসায়ীরা এতে বিরক্ত হলেও, নিগ্রোদের সম্মিলিত দাবীর

বিরুদ্ধে যেতে পারছে না। নিগ্রো-উন্নতির জন্য মোটা অঙ্কের 'চাঁদা' দিয়ে 'ঘেটো'তে নিজেদের ব্যবসা অক্ষুন্ন রাখছে। এই ব্যবস্থা আরো বিস্তৃত করতে হলে নিগ্রোদের মধ্যে আনতে হবে আরো সংঘবদ্ধতা, দৃঢ়তা এবং শৃঙ্খলাবোধ।···

বর্তমান মার্কিন সংবিধানে অল্প কিছু নিগ্রো জাতীয় সভায় নির্বাচিত হবার সুযোগ পেলেও নিগ্রোরা যে সামগ্রিক ভাবে তাতে উপকৃত হয়েছে, এ কথা বলতে পারি না। মার্কিন রাজনীতির নীতি নির্ধারণে নিগ্রোদের অংশ গ্রহণ অতি নগণ্য। স্থানীয় শাসন-পরিষদগুলিতেও সেই একই হাল। শিকাগোর city councilএ অবশ্য জনাদশেক নিগ্রো প্রতিনিধি আছেন; কিন্তু তাঁদের মধ্যে দু'জন কিংবা তিনজনের কণ্ঠস্বরই শোনা যায়। আসলে আমেরিকার বর্তমান সংবিধান যারা ক'রে গেছেন, তাঁদের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল, নিগ্রোদের রাজনৈতিক অধিকারকে পরিপূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হতে না দেওয়া।

গণতান্ত্রিক অধিকার আদায় ক'রে নেবার জন্য নিগ্রোদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস আনা দরকার। এই আত্মবিশ্বাস নিয়েই শিকাগোবাসী নিগ্রো স্যামে রায়নার ১৯৬৩ সালে আমেরিকার অন্যতম কংগ্রেসম্যান উইলিয়ম ডাওসনের বিরুদ্ধে নির্বাচন-প্রতিযোগিতায় নেমে আসেন। এবং সামান্য ভোটের ব্যবধানে পরাজিত হ'য়ে চারদিকে আলোড়নের সৃষ্টি করেন। নিগ্রো সমাজ ক্রমশই জাতীয় সভায় নিজেদের প্রতিনিধি নির্বাচিত করতে সচেষ্ট হয়ে উঠছে।

খুবই উৎসাহের ব্যাপার যে, নির্বাচনে বার বার চেষ্টা করার পর ১৯৬৭ সালে স্যামে রায়নার বিজয়ী হলেন। তাঁর ব্যক্তিগত বন্ধু ও প্রচার-সচিব ফিলিপ স্মিথের সমীক্ষাটি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়:

"···Another key to Sammy's victory was the fact that he began to methodically get himself around the Sixth Ward. Making the black club functions,

attending youth meetings and all the functions that were dear to the hearts of Sixth Ward people became the order of the day…"

একজন বা দু' জন রায়নার হয়তো অনেক কষ্টে আসন লাভ করতে পারেন। কিন্তু তাতে নিগ্রোদের অবস্থার কোন হের-ফের ঘটবে বলে মনে হয় না। মার্কিন সংবিধানে সংখ্যালঘু নিগ্রোদের জন্য যথেষ্ট সংখ্যক আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা উচিত। শাসন বিভাগে প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ করতে না পারায় নিগ্রো-সমাজে সৃষ্টি হয়েছে দারুণ হতাশা। এই হতাশা চরমভাবাপন্ন নিগ্রো-উত্থানে সহায়ক।

অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনে নিগ্রোদের হতাশা সীমাহীন বলা চলে। আমেরিকার যে প্রচণ্ড ধন সম্ভার, তার প্রায় সবটুকুই সাদাদের হাতে। কালোদের প্রাণপাত শ্রমে গড়ে ওঠা বনিয়াদ সাদারা বরাবরই ভোগ করে আসছে। সাধারণ নিগ্রো-জীবনে আছে বেকারিত্ব, উদ্দেশ্যহীন বিকার এবং অন্ধ ভবিষ্যৎ। ১৯৪৬ সালের জুন মাসের একটি সমীক্ষায় দেখা যায় যে, যুক্তরাষ্ট্রে সাদা বেকারিত্বের আনুপাতিক গড় যেখানে শতকরা ৪'১ সেখানে কালোদের বেকারিত্বের গড় প্রায় দ্বিগুণ,—শতকরা ৮'৩ জন।

চাকুরি পাওয়ার ক্ষেত্রে আমেরিকায় সাদা-কালোর দৃষ্টিকটু বিভেদ নীতি এখনও অনুসৃত হয়ে আসছে। একজন গ্রাজুয়েট নিগ্রো যুবককে এখানে স্কুলে পড়া কোন শ্বেতাঙ্গ ছাত্রের সাথে তুলনা করা হয়। এমন কি, চাকুরির প্রতিযোগিতায় নামলে ঐ শ্বেতাঙ্গ ছাত্রটিই কাজ পাবে, নিগ্রো গ্রাজুয়েটকে সেখানে বিমুখ হতে হবে। তাজ্জব ব্যাপার! বিচিত্র মার্কিন সভ্যতা! এরাই আবার পৃথিবীর অন্যদেশে সাদা-কালোর সমতা আনতে উপদেশ দেয়। বর্ণদ্বেষী রোডেশিয়া বা দক্ষিণ আফ্রিকাকে অপ্রত্যক্ষ প্রশ্রয় দেওয়া মার্কিন সরকারের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক; কারণ

তার নিজের বুকেই কালোদের যেভাবে পদদলিত করা হচ্ছে, তা শুনলে আমাদের অনেক ধারণাই পাল্টে যাবে। নিগ্রো অর্থনীতিবিদ ডঃ এনড্রু এফ. ব্রাইমার বলেছেন:

"...Perhaps the most striking feature...is the fact that a non-white man must have between one and three years of College before he can expect to earn as much as a white man with less than eight years of schooling, over the course of their respective working lives. Moreover, even after completing College and spending at least one year in graduate school, a non-white man can expect to do about as well as a white person who only completed high School..."

লিঙ্কনের দেশ আজও এমন সাদা-কালোর বিভেদনীতিতে ধুঁকছে। কাজেই এর সভ্যতার মর্মে অনেক ক্লান্তি, অবক্ষয়ী হতাশা এবং ক্ষয়িষ্ণু উৎসাহ আজ অনুভূত হয়।

ডঃ ব্রাইমারের গবেষণা থেকেই জানতে পেরেছি, একজন অর্ধ শিক্ষিত শ্বেতাঙ্গ ('যে স্কুলের গণ্ডী পেরিয়ে কলেজে ঢুকবার যোগ্যতা পর্যন্ত অর্জন করেনি) সারা জীবনে কম পক্ষে দু' লক্ষ তিপ্পান্ন হাজার ডলার উপার্জন করবে; আর একজন উচ্চ শিক্ষিত নিগ্রো (যে অন্তত পাঁচ বৎসর কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষার পাঠ নিয়েছে) জীবন ব্যাপি পরিশ্রমে বড় জোর উপার্জন করতে পারে দু'লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার ডলার।

সাদা ব্যবসায়ীরা নিগ্রো ঘেটোগুলিতে জাঁকিয়ে বসেছে। ব্যবসা-বাণিজ্য নিগ্রোদের হাতে নেই বললেই চলে। স্বল্প আয়, ধার করে ব্যবসায় নামতে গেলে সাদাদের সমবেত চাপে মার খাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা। অনেক সময় 'ঘেটো-বাজার'গুলিতে

সাদা ব্যবসায়ীরা খুশীমতো ভোগ্য পণ্যের দাম বাড়িয়ে দেয়। সংসার চালাতে গিয়ে একজন বস্তীবাসী কালোকে একজন শহরবাসী সাদার চাইতে তুলনামূলক ভাবে অনেক বেশী খরচ করতে হয়। Urban League এর সদস্য হুইটলি ইয়াং তাঁর অতি পরিচিত To Be Equal বইতে লিখেছেন:

"...Most of Chicago's 838,000 Negroes live in a ghetto and pay about 20 more per month for housing than their white Counterparts in the City..."

ঠিক এই ভাবেই 'স্লো পয়জন' করা হচ্ছে নিগ্রোদের। যথেষ্ট সন্ধানী দৃষ্টি মেলে না ধরলে শোষণতন্ত্রের এমন ফল্গুধারা সাধারণের কাছে ধরা পড়বে না।...

আমরা অন্যদেশের মানুষ। এখানে এসে বাস করি শহরে। বৈভব ও বিলাসের স্রোত দেখে চোখ ও মন ধাঁধিয়ে যায়। সুবেশ নিগ্রো যুবককে দেখতে পাই বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে, নাইট ক্লাবের গুঞ্জনে; নিগ্রো হিপিনীদের সাক্ষাৎ পাই সমুদ্রের বেলাভূমিতে। তাই এখানকার অবরুদ্ধ কান্না, হতাশা, ক্লান্তি এবং জীবনীশক্তির বিপুল অপচয়ের কথা সচরাচর ভেবেই উঠতে পারি না।

ঘুরে ফিরে সেই পুরনো উক্তিই করতে হচ্ছে 'সাদারা মনে করে কালোরা তাদের চিরন্তন দাস।' এই দাসত্ব চিরায়ত। মার্কিন অচলায়তনে তারা তাদের শ্রম সস্তায় বিকিয়ে যাবে বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ। সেই কোন অতীতে তাদের জাহাজে চাপিয়ে আনা হয়েছিল এই দেশকে গড়তে। কাজ করেছে তারা দক্ষিণের তুলোর খেতে আর উত্তরের কল-কারখানায়। চাবুক আর পোড়া রুটি—দুটোই মিলতো সমভাবে। সেই মৃত্যুর নোটিশ আজো লিখে চলেছে আমেরিকান নিগ্রোরা।

কালোরা এই দেশ রক্ষায় অনেক রক্ত বিসর্জন দিয়েছে, তাদের আনুগত্যও ছিল এ যাবৎ সমস্ত প্রশ্নের অতীত ; কিন্তু সাদা-কালোর সমতা আজও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। সাদাদের স্বার্থরক্ষায় কালোদের রক্তপাত,—সাম্রাজ্যবাদের এটা প্রধান বৈশিষ্ট্য। সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকায় তা অত্যন্ত প্রকট।

আমেরিকানরা তাঁদের নেতা উড্রো উইলসনকে নিয়ে প্রায়ই গর্ব করে থাকে। এই মানুষটির অনেক উক্তি তারা সগর্বে উল্লেখ করে থাকে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে আমেরিকার যোগদানের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে উইলসন বলেছিলেন ঃ

"We have joined to make the World safe for democracy."

মার্কিনবাসীদের জন্য সুখ-সমৃদ্ধি, একতা ও সাম্যের বাণী উইলসন সাহেব প্রচার করেছিলেন। অথচ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হয়েও তিনি নিজেকে নিগ্রো-বিদ্বেষের উর্দ্ধে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি। মুক্তিকামী নিগ্রোদের প্রতি তাঁর ঘৃণা, উপেক্ষা ও সন্দেহ আমাদের বিস্মিত করে। ১৯০১ সালে নিগ্রোদের সম্পর্কে উইলসন যে ভাষণ দেন, তার উল্লেখ না করে পারছি না ঃ

"An extra ordinary and very perilous state of affairs had heen created in the South by the sudden and absolute emancipation of the Negroes, and it was not strange that the Southern legislatures should deem it necessary to take extraordinary steps to guard against the manifest and pressing dangers which it entailed. Here was a vast 'Laboring, landless, homeless class,' once slaves ; now free ; unpracticed in liberty, unschooled in self-control ; never sobered by discipline of self-

support; never established in any habit of prudence; excited by a freedom they did not understand, exalted by false hopes. bewildered and without leaders, and yet insolent and aggressive; sick of work, covetous of pleasure—a host of dusky children untimely put out of school."

আমেরিকার খোদ প্রেসিডেন্টের যদি এই ভাষ্য হয়, তা হলে সে দেশের সাধারণ মানুষ যে বর্ণদ্বেষী হবে তাতে আশ্চর্যের কী আছে! মনে হয় এরা চেয়েছিল slavery আরো কয়েক শতাব্দী ধরে আমেরিকার বুকে কায়েম থাকুক!

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিত্রপক্ষের স্বার্থরক্ষায় নিগ্রোরা যে ভাবে আত্মহুতি দিয়েছে, ইতিহাসে তার তুলনা বিরল। উত্তর আফ্রিকার মরু-যুদ্ধে, নর্মাণ্ডির বৃহত্তম রণাঙ্গনে, আটলান্টিকের জলযুদ্ধে, লণ্ডন রক্ষায়···নিগ্রো রক্ত উৎসারিত হয়েছে। কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই সাদারা কালোদের এই কৃতিত্বকে স্বীকৃতি দেয়নি। মার্কিন সমর দপ্তর কখনও কোন নিগ্রোর সামরিক প্রতিভার সম্মান দিতে চায়নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন জর্জিয়ায় একটি বিল আনা হয়। এই বিলে বলা হলো, কোন নিগ্রোকে কখনো কমিশনড বা নন-কমিশনড অফিসারের পদগৌরবে সম্মানিত করা চলবে না। এরা বরাবরই থাকবে সাধারণ সৈনিকের পর্যায়ে,—ফিল্ডগান, মর্টার আর স্টেনগান নিয়ে নিছক হুকুম তালিম করে যাবে; হুকুম দেবার অধিকার তারা কখনও পাবে না। বিচিত্র গণতন্ত্র! এরাই আবার গালভরা আদর্শের কথা বলে!

মহাযুদ্ধের সময় সেনা-শিবিরে নিগ্রো সৈন্যদের উপর নানা রকম মানসিক নির্যাতন চালানো হতো। সাদা সৈন্যদের কাছ থেকে তারা পেতো নিছক উপেক্ষা, ঘৃণা ও বিদ্রূপ। অধ্যাপক

গারফিংকল নিগ্রো সৈন্যদের দুরবস্থার উপর সমীক্ষা চালিয়ে একটি বই লিখেছিলেন। বইটির নাম When Negroes March. এর একটি পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন :

'When defense jobs were finally opened up to Negroes, they tended to be on the lowest rungs of the sucess ladder.'

মার্কিন সেনা বাহিনীতে নিগ্রোদের কখনও বেশী বেতনের বা অপেক্ষাকৃত সম্মানের পদে নিয়োগ করা হতো না। প্রফেসর গার ফিংকল আরো বলেছেন :

"While we are in complete sympathy with the Negroes, it is against Company policy to employ them as aircraft workers or mechanics···"

অথচ যুদ্ধের মূল ঝুঁকি নিগ্রোরাই বহন করেছে। নিগ্রোদের কাঁধে বন্দুক রেখে 'ফায়ার' করেছেন শ্বেতাঙ্গ সরকার আর যুদ্ধ শেষে বিগলিত হেসে বলেছেন : গণতন্ত্রকে রক্ষা করবার জন্য আমরা লড়েছি এবং বিজয়ী হয়েছি।

এই যদি গণতন্ত্রের নমুনা হয়, তবে ফ্যাসিবাদ বা নাৎসীবাদের বিরুদ্ধে এত কুৎসা রটাবার কী আছে!

জার্মান যুদ্ধ বন্দীদের চাইতেও নিজের নিগ্রো সৈন্যদের উপর বেশী অমানুষিক ব্যবহার করেছেন মার্কিন সরকার। একটি ছোট ঘটনার উল্লেখ করছি :

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ লগ্নক্ষণ সেটি। দক্ষিণ আমেরিকার একটি ট্রেন ছুটে চলেছে কয়েক শ' জার্মান যুদ্ধবন্দীদের নিয়ে। ওদের পাহারায় রয়েছে কয়েক হাজার নিগ্রো সৈন্য। শ্বেতাঙ্গ জার্মান বন্দীদের জন্য সমর দপ্তর ঘন ঘন পুষ্টিকর খাবার পাঠাচ্ছে; আর সেই ট্রেনের কৃষ্ণাঙ্গ সৈন্যদের জন্য দিনের মধ্যে একবারের বেশী খানকতক পোড়া রুটি ও সবুজ সবজি আসছে না। বন্দী হলেও

জার্মানরা যেহেতু সাদা চামড়ার মানুষ, তাই তারা কালো চামড়ার নিগ্রো সেনাদের চাইতে অনেক বেশী সুযোগ-সুবিধার অধিকারী।···

এমন শোষণ ও পেষণ চলেছে 'টম কাকার কুটীর'-এর যুগ থেকে। আগে ছিল তা প্রত্যক্ষ ও সোচ্চার। আর এখন অপ্রত্যক্ষ এবং প্রায় নীরব। এই অত্যাচারের ফল কত ভয়ানক! পুরুষানুক্রমে এমন অত্যাচারিত হবার ফলে নিগ্রোরা তাদের স্বাভাবিক বিকাশের পথ খুঁজে পাচ্ছে না। একজন নিগ্রো শিশু জন্মের পর থেকে অনবরত এমন অপমানিত হতে থাকলে যৌবনে সে হয়ে উঠবে আত্মবিশ্বাসহীন ও আত্মসম্মান সম্পর্কে অচেতন সন্দেহপ্রবণ এক ব্যক্তি। লক্ষ লক্ষ মানুষের সর্বনাশ করে চলেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের Dark Ghetto গুলি:

Human beings who are forced to live under ghetto conditions and whose daily experience tells them that almost nowwhere in society are they respected and granted the ordinary dignity and courtesy accorded to others will, as a matter of course, begin to doubt their own worth.

[Kenneth Clark]

তা হলে, পর্তুগাল-শাসিত আফ্রিকানদের সাথে আমেরিকাবাসী এই সমস্ত নিগ্রোদের তফাৎ কোথায়?

'ঘেটো-জীবন' থেকে কী কোন আমেরিকাবাসী নিগ্রো মুক্তি পেতে পারে না?

পারে। যদি সে নিজে কালো হয়ে কালোদের অস্বীকার করে, নিগ্রো-সংস্কৃতির প্রতি ঘৃণা জানায় এবং সাদাদের প্রতি বার বার নিজের আসক্তি প্রকাশ করতে থাকে, তবে মার্কিন সমাজ তাকে ঘেটোর অভিশাপ থেকে মুক্তি দিতে রাজি আছে। সাদাদের লেজুড় ধরা এমন নিগ্রোদের সংখ্যা কম নয়। ময়ূর-পুচ্ছধারী

কাকের মতো তাদের অবস্থা। ঐতিহ্য সম্পর্কে অনবহিত, অতীতভ্রষ্ট নিগ্রো তারা। মার্কিন শ্বেতাঙ্গ সমাজ এদেরকে নিগ্রোদের প্রতিনিধি বলে প্রচার চালায় এবং নিগ্রো সম্পর্কিত যা কিছু আলোচনার তা এদের সাথেই করে থাকে। বলাবাহুল্য সেই সমস্ত আলোচনায় নিগ্রো উন্নতির কোন বাস্তব পন্থাই অবলম্বিত হয় না।

এই যে অত্যাচার, অবজ্ঞা, শোষণ ও ঘৃণা, তা একদিকে যেমন নিগ্রোদের নৈতিক শক্তিকে ভেঙ্গে দিয়েছে, অপরদিকে তেমনি চরমপন্থী নিগ্রোদের উত্থান সহজতর করে তুলেছে। নিগ্রোরা নিজেদের স্বাভাবিক ঘৃণা নিয়ে পাল্টা অবজ্ঞা করছে সাদাদের, অস্বীকার করছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রব্যবস্থাকে। আজ ওদের বেপরোয়া অভিপ্রকাশে শঙ্কিত সাদা সমাজ, চিন্তার কুঞ্চন পড়েছে রাষ্ট্রনায়কদের কপালেও, রক্তচক্ষু নিয়ে তাঁরা ভাবছেন ঃ জমানা বদল গিয়া!

জমানা বদলের ঝড় নিয়ে এলেন এলিজা মহম্মদ! তাঁর কৃষ্ণ মুসলীম সমাজ সজোরে নাড়া দিয়েছে নিগ্রো ঘেটোগুলিতে এবং সাবধান করে দিয়েছে সাদাদের। এলিজা জানেন, তাঁর এগিয়ে যাবার পথে প্রথম ও প্রধান বাধা হলো 'নিগ্রো-মানসিকতা'। দীর্ঘদিন শ্বেতাঙ্গ-শাসনে পীড়িত হবার ফলে শ্বেতাঙ্গ-সমাজের প্রতি তাদের এক ধরণের দুর্বলতায় পেয়ে বসেছে। এই দুর্বলতার হাত থেকে মুক্তি না পেলে জেহাদ ঘোষণায় ওদের আসবে দ্বিধা, সংকোচ ও ভয়। হীনমন্যতায় ভুগছে এ দেশের অধিকাংশ নিগ্রো। সেখানে আত্মবিশ্বাস ও আত্মসম্মানবোধ ফিরিয়ে আনা খুব কঠিন।

এলিজা মহম্মদ তাই 'মগজ-ধোলাই'য়ের ব্যবস্থা নিয়েছেন। নিগ্রোদের সব কয়টি সুপ্ত তন্ত্রে যেন উত্তেজনা ঢেলে দিচ্ছেন। ওরা লাফিয়ে উঠে চাইছে নিজেদের স্বতন্ত্র দেশ, স্বতন্ত্র সমাজ, স্বতন্ত্র সংবিধান। অকল্পনীয় দৃশ্য!

জানিনা, নিগ্রোরা ক্রমশ নিজেদের বৈশিষ্ট্য ভুলে যাবে কি না!

অতিরিক্ত হীনমন্যতায় ভুগবার ফলে হয়তো একদিন নিজেদের সংস্কৃতিকেই ঘৃণা করতে শুরু করবে। সেটা হবে নিদারুণ বেদনাদায়ক। কারণ, নিগ্রোদের যে সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য, স্বকীয়তায় তা অনন্য। যে কোন দেশের সভ্যতার ধারাকে তারা উন্নততর করতে পারে,—তাদের নিজস্ব সঙ্গীত, লোকগাথা এবং নাচ নতুন দিগন্তের সন্ধান দেয়।

আমেরিকা যদি আজও নিগ্রোদের স্বীকৃতি না দেয়, স্বাভাবিক প্রীতির বন্ধনে গ্রহণ না করে, তবে এই দেশের মূলভিত্তিতে অচিরেই বিরাট ফাটল ধরবে। কারণ, নিগ্রোদের উপর নির্ভর করেই মার্কিন উন্নতির বনিয়াদ গড়ে উঠেছিল। এখন নিগ্রোরা সচেতন হতে শিখেছে, ওদের দৃষ্টি হয়েছে প্রসারিত; কিন্তু এখনও যদি তারা সেই দাস-সুলভ ব্যবহারই পেতে থাকে, তবে সমগ্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি তাদের ঘৃণা বিস্ফোরণের আকার নেবে। সেই প্রচণ্ড বিস্ফোরণে থরথরিয়ে কাঁপবে হোয়াইট হাউস, আকাশ-চুম্বী অট্টালিকাগুলি ধ্বসে পড়বে, ফাটল ধরবে আব্রাহাম লিংকনের প্রতিমূর্তিতে, স্ট্যাচু অব লিবার্টি তলিয়ে যাবে সমুদ্রের গহ্বরে, আর সেই ধ্বংসস্তূপের মধ্যে দাঁড়িয়ে খল খল অট্টহাসিতে ফেটে পড়বেন সার সার নিগ্রো মুসলমান নেতার দল,—ড্রিউ আলী, শেখ ক্লাড গ্রীণ, ডব্লু. ডি. ওয়ালেচ ফ্রাড, এলিজা মহম্মদ,·· ইত্যাদি ইত্যাদি।

সেই ভয়াবহ সম্ভাবনার হাত থেকে মুক্তির জন্য এখনও সময় আছে। এখনও সুযোগ আছে উদার ও সহৃদয় হয়ে নিগ্রোদের স্বীকৃতি দেবার। না হলে, পম্পাই নগরীর শেষ দিনটির মতো গভীর হাহাশ্বাসে ডুবে যাবে আমেরিকা। এত এ্যাটম, হাইড্রোজান, নিউট্রন বোমা তার বৃথাই যাবে; এমন বিলাস আর বৈভবের সম্ভারকে মনে হবে মূল্যহীন, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জুটবে আরও অপমান।

নিজের সামগ্রিক অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই কালোদেরকে আজ স্বীকৃতি দেওয়া উচিত মার্কিন শ্বেতাঙ্গদের। আমেরিকার গৌরব তাতে বাড়বে, দেশের প্রাণ প্রবাহে নতুন চেতনা অনুভূত হবে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নৈতিক অবক্ষয় দূর হবে! আমরা সেই প্রত্যাশায় বসে আছি। আমেরিকাবাসী আমাদের শত্রু নয়। বিশ্বের কোন একটি দেশ নিজের আত্মিক উন্নতিতে সমর্থ হলে অপর দেশগুলিও তাতে উপকৃত হয়। আজ আমেরিকা যদি সাদা-কালোর সমতা আনতে পারে, কাল রোডেশিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, পর্তুগাল-শাসিত আফ্রিকা নিজেদের বিপন্ন বোধ করবে। ওরা বাধ্য হবে নিজেদের চরিত্র সংশোধন করতে। প্রকৃতপক্ষে আমেরিকার কাছ থেকেই ওরা এমন বর্ণ বিদ্বেষের প্রেরণা পায়। বিরাট গণতান্ত্রিক শক্তি আমেরিকার যদি এই হাল হয়, তবে রোডেশিয়া বা, দক্ষিণ আফ্রিকা তো কালোদের রক্তে হোলি খেলবেই! আব্রাহাম লিংকন, জন কেনেডি,—এঁদের প্রতি অবিচল শ্রদ্ধায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান এবং আগামী সরকার নিশ্চয় আপ্রাণ প্রয়াস পাবেন সাদা-কালোর মধ্যে সমতা আনতে। সমতা না এলে, চরম প্রতিক্রীয়াশীল উত্থান অনিবার্য; সাদা-কালোর ভয়াবহ লড়াই তবে এক চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে যাবে। হয়তো এরই স্ফূলিঙ্গে একদিন বিশ্বব্যাপি মহাযুদ্ধের নাকাড়া বেজে উঠবে!

তুলি-কলম-এর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ

কালরাত্রি	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	৮·০০
মহানগরী	ঐ	৫·০০
সবার প্রিয় সুভাষ	সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ	১০·০০
নকশালবাড়ি	ঐ	৮·০০
ব্যভিচারিণী	ঐ	৮·০০
সমাজবিরোধী	পি. সরকার	৭·০০
ফাঁসি মঞ্চ থেকে	শৈলেশ দে	৫·০০
অগ্নিযুগের নায়ক	অমরেন্দ্রকুমার ঘোষ	৫·০০
শত শহীদের রক্তে	ঐ	৬·০০
নির্যাতিত নিগ্রো	শেখর সেনগুপ্ত	৪·০০
জ্যোতি বসু জবাব দাও	বহুরূপী	৪·০০
মাও সে-তুং একটি নাম	বেদুইন	১২·০০
পিকিং থেকে বলছি	ঐ	১০·০০
রাজা আর নেই	ঐ	৮·০০
মন্ত্রীপতন	ঐ	৮·০০
রক্তে রাঙা লাওস	ঐ	৬·০০
রাজনীতির দাবাখেলা	ঐ	৬·০০
উপেক্ষিত বসন্ত	ঐ	৫·০০
মাও সে-তুঙ-এর চিন্তাধারা	ঐ	৫·০০
স্বর্গখেলনা	উত্তমপুরুষ	৬·০০
ভোরের গোধূলি	অবধূত	১০·০০
অনাহুত আহুতি	ঐ	৫·০০

ক্লাবের নাম কুমতি	প্রেমেন্দ্র মিত্র	৪·০০
কোমল গান্ধার	নীহাররঞ্জন গুপ্ত	৮·০০
নিশিবধূ	ঐ	৬·০০
উষসী	ঐ	৬·০০
সূর্যমহল	ঐ	৬·০০
লভিনু সঙ্গ তব	ঐ	৬·০০
দরবারী	ঐ	৩·৫০